নিবেদন

এই সময় ও ভাবনার পত্রিকা

ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা জুলাই, ২০২৩

With Best Compliments From :-

Ph. : 033 2488 9829
Mob. : 98303 01554

Kundu Guinea Museum

Manufacturing of Gold & Order Suppliers

492, Diamond Harbour Road, Behala,
Kolkata - 700 034
(Opp. Siddheswari Kali Mandir)
Thursday Closed

With Best Compliments From :-

मन्टु दे

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

सदस्य अधिकर्ताओं के लिये मंडल प्रबंधक क्लब

कार्यालय : सरसुना शाखा, 620, डायमन्ड हारबार रोड (तृतीय तल) कोलकाता – 700 034
टेली : (033) 2397 9635, 2407 1875
निबास : बेहाला, 49/28, नेताजी सुभाष रोड, दक्षिण 24 परगणा, कोलकाता–700 034
मोबाईल : 9831721230 ई–मेल : mantudey2010@gmail.com

● सदस्य ●
अधिकर्ताओं के लिए
मंडल प्रबंधक क्लब
●
● MEMBER ●
DIVISIONAL'S MANAGER
CLUB FOR AGENT

Mantu Dey

Member of the Divisional Manager's Club for Agents

Office : Sarsuna Branch, 620, Diamond Harbour Road (4th Floor), Kolkata - 700 034
Tel.: (033) 2397 9635, 2407 1875
Resi. : Behala, 49/28, Netaji Shubhas Road, 24 Pgs (S), Kolkata - 700 034
Mobile : 9831721230, E-mail : mantudey2010@gmail.com

With Best Compliments From :-

Admission Going on

TINY TOTS

ENGLISH MEDIUM SCHOOL

51, Sisir Bagan Road, Kolkata - 34

Montessori - Class - IX

Contact : 9831802586

With Best Compliments From :-

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ভারত সরকার অধীনস্থ)

punjab national bank
(Govt. of India Undertaking)

Oriental United

Base Branch :	RAI BAHADUR ROAD	বেস ব্রাঞ্চ ঃ	রায় বাহাদুর রোড
Sub Service Area :	BEHALA	সাব সার্ভিস এরিয়া ঃ	বেহালা
Base Branch Phone No.:	033-24031916	বেস ব্রাঞ্চ ফোন নং ঃ	০৩৩-২৪০৩১৯১৬
Business Correspondent Name :	KAUSTAV DASGUPTA	ব্যাঙ্ক মিত্রের নাম ঃ	কৌস্তুভ দাশগুপ্ত
Mobile No. :	**9830792276**	ব্যাঙ্ক মিত্রের মোবাইল নং ঃ	৯৮৩০৭৯২২৭৬
Kiosk Operation Timings :	Morning - 10 A.M. to 2 P.M Evening - 5 P.M. to 9 P.M	পরিষেবা প্রদানের সময় ঃ	সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা

Customer Service Point

With Best Compliments From :-

PP

PAPAI PAINTS

HOUSE PAINTS SOLUTION

Dealer of asianpaints Berger

796K, Raja Rammohan Roy Road,
Madan Mohantala, Kolkata - 700008
Mobile : 9830648788 / 9674805833

Tanoy Mondal

নিবেদন

পাঠক-পাঠিকাদের নিজস্ব ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।
মানবজীবনে চলার পথে সঞ্চিত, জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কুসুমকলিকে
প্রস্ফুটিত করার আমাদের এ এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

-ঃ সম্পাদক মণ্ডলী ঃ-

সভাপতি

অধ্যাপক ড. গৌতম ভট্টাচার্য

প্রধান উপদেষ্টা

শ্রী অপূর্ব কর্মকার, শ্রী অসীমবন্ধু খাঁড়া

প্রকাশনা উপদেষ্টা

জয়ন্ত সুকুল

প্রচ্ছদ অলংকরণ

রমেন্দু মিত্র

প্রচার সহায়ক

সমর প্রামাণিক

সম্পাদক

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

-ঃ সদস্যবৃন্দ ঃ-

ডা. বিপদতারন দাস, ড. অনিন্দ্যবন্ধু গুহ, শ্রী কল্যাণ কুমার সুর,
শ্রী অসিত পালিত, শ্রীমতী সুস্মিতা ত্রিপাঠী (ব্যানার্জী) শ্রীমতী তৃপ্তি রায়,
ড. অমলেন্দু হাজরা, শ্রী অভিজিৎ লাহিড়ী, শ্রীমতী চম্পা পাল

‘নিবেদন’-এর সার্বিক যোগাযোগের ঠিকানা

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল
৭০/১১, বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪
দূরভাষ ৯০৫১১ ৯২১৮০ (হোয়াটসঅ্যাপ)

শ্রী অপূর্ব কর্মকার
৭০বি/১, বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪

বি.দ্র. - ‘নিবেদন’-এর জন্য যে লেখাগুলি পাঠাবেন তা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখা পাঠান ওপরের **Whatsapp e-mail : iapurbakarmakar@gmail.com** -এর মাধ্যমে। **Unicode** বাঞ্ছনীয়, **PDF** নয়, **Word File** পাঠান, সঙ্গে ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অনুগ্রহ করে অবশ্যই জানাবেন।

সম্পাদকীয়

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নয়, নিছক সারস্বত সৃষ্টিধর্মী কোনো একটি কাজ করা যায় কী না-এই চিন্তা ভাবনার ফসল-'নিবেদন' সাহিত্য পত্রিকা। পথচলা শুরু খুবই সাধারণভাবে। নানান প্রতিকূলতা অতিক্রম করে গুটি গুটি পায়ে তা বর্তমানে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। বিগত বছরগুলির মতোই 'নিবেদন' পত্রিকার প্রতি আপনাদের প্রকাশ অভিমুখী ঔৎসুক্যতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রত্যাশার অবসান ঘটিয়ে বর্তমান সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পত্রিকা প্রকাশনা একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। লেখা সংগ্রহ করা, প্রিন্ট করা, প্রুফ দেখা, প্রচ্ছদ নির্মাণেরমতো দুরুহ কাজগুলো করে যাঁরা নিবেদনকে দিনের আলো দেখতে সাহায্য করছেন-নিস্বার্থ, পরিশ্রমী সেইসব শ্রদ্ধেয় সুহৃদ ব্যক্তিদের বিশেষ করে রামেন্দ্র মিত্র ও অপূর্ব কর্মকার মহাশয়কে আলাদা করে কুর্নিশ জানাই। বিপন্ন পৃথিবীর আবহাওয়াগত পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক টানাপোড়েন, তুরস্কের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের যেমন ব্যথিত করে, তেমনি পৃথিবীর বহু দেশের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা ও মানবসমাজকে চরম বিপদের দিকে নিয়ে যাওয়ার অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে তাতেও আমরা ব্যথিত ও শঙ্কিত। সমকালীন ঘটে যাওয়া এসব ঘটনাবলির আলেখ্য সাহিত্য রচনায় প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা আমাদের আছে এবং থাকবে। যার মাধ্যমে বেঁচে থাকার আশীর্বানী নিয়ে পথ দেখাবে মানবসমাজকে।

বহতানদীর মতো সময়, সমাজ, সভ্যতা সব কিছুই এগিয়ে যায় আপন গতিতে। আমরাও 'নিবেদন'কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করব আপনাদের সহযোগিতায়। বিগত দু-বছর ধরে কলকাতা বই মেলার মতো বৃহত্তর সাহিত্য মেলায় আমাদের পত্রিকা বেশকিছু পাঠক-পাঠিকার হাতে আমরা তুলে দিতে পেরেছি। আগামী দিনেও আপনাদের মূল্যবান রচনা বইমেলার পাঠককুলের হাতে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাও থাকবে।

পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত শ্রদ্ধেয় সকল লেখক, লেখিকা, প্রচ্ছদ শিল্পী, প্রকাশক, প্রকাশনা উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপন দাতা, সম্পাদকমন্ডলীসহ অগণিত শুভানুধ্যায়ীকে অভিনন্দন জানাই। পরিশেষে জানাই, আমাদের পরিশ্রম তখনই স্বার্থক হবে আপনাদের ভালোবাসা, প্রশংসা কিংবা গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ পেলে। এরফলে আগামী সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য আরও উৎসাহ পাব। সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই নিবেদন-এর পক্ষ থেকে।

সম্পাদক

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

সূচিপত্র

কবিতা ঃ

অন্তহীন □ সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ● পৃ. ৫, মৃত্যু ও জীবন □ শ্রাবণী চক্রবর্তী ● পৃ. ৫, ডায়েরি □ আলপনা ব্যানার্জী ● পৃ. ৫, জীবন □ সুস্মিতা ত্রিপাঠী ব্যানার্জী ● পৃ. ৬, নরকের কীট, বলছি □ প্রতীপ মুখোপাধ্যায় ● পৃ. ৬, ৭, পিকনিকে হঠাৎ দেখা □ কল্যাণ কুমার সুর ● পৃ. ৭, জুয়া □ চিরপ্রশান্ত বাগচী ● পৃ. ৭, একসাথে □ চয়নকান্তি দাস ● পৃ. ৭, মহুলটাঁড়ের ফুলমতী, স্বপ্নের পাণ্ডুলিপি □ জয়ন্ত সুকুল ● পৃ. ৮, মুরশিদাবাদ □ শুভশ্রী সরকার ● পৃ. ৮, নীরব কেন ফাগুন তুমি, অতঃপর একটি নতুন মৃত্যু □ রাজু হাজারী ● পৃ. ৯, লতাজি □ তপন আইন ● পৃ. ৯, পথচলা, মুক্তির খোঁজে □ অমিতাভ কুন্ডু ● পৃ. ১০, মেঘপিয়োনের চিঠি, শাওন □ নিরাশাহরণ নস্কর ● পৃ. ১০, আমি কে □ পূবালি চক্রবর্তী ● পৃ. ১১, চিঠি □ অসিত পালিত ● পৃ. ১১, ভালোবাসা □ মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ● পৃ. ১১, বিবর □ শমীক রুদ্র ● পৃ. ১১, খাঁটি আশ্রয় □ উজ্জ্বল ভট্টাচার্য্য ● পৃ. ১২, প্রকৃত প্রেম, সময়ের ঠিকানায় □ প্রভাতী ভট্টাচার্য্য ● পৃ. ১২, ১৩

গল্প ঃ

টরনটোর আশু পুরোহিত □ ড. গৌতম ভট্টাচার্য্য ● পৃ. ১৪-১৭, একান্ত আপন □ আরতি ভট্টাচার্য্য ● পৃ. ১৮-২০, ইনফর্মার □ অপূর্ব কর্মকার ● পৃ. ২১-২৫, ভালোবাসা কারে কয় □ মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ ● পৃ. ২৬-২৮, নরহরির ইতিবৃত্ত □ ডা. বিপদতারণ দাস ● পৃ. ২৯-৩১, ভাগাবান্দ গ্রামে রাতদিন □ অপূর্ব মিত্র ● পৃ. ৩২-৩৪, সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল □ তাপস চ্যাটার্জী ● পৃ. ৩৫-৩৬, অনাস্থা □ সমরকৃষ্ণ মণ্ডল ● পৃ. ৩৭-৪১,

ভ্রমণ ঃ

গঙ্গোত্রীর পথে □ প্রসেনজিৎ মিত্র ● পৃ. ৪২-৪৪,

প্রবন্ধ ঃ

যুগ যুগ জিও □ ঋত্বিক দে ● পৃ. ৪৫-৪৯, মার্গসংগীত-এর গল্পগাথা রূপকথা □ ড. অমলেন্দু হাজরা ● পৃ. ৫০-৫৩, আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আলোকে মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার □ ড. দেবদাস মণ্ডল ● পৃ. ৫৪-৬০,

চিঠিপত্তর ● পৃ. ৬১

কবিতা

অন্তহীন

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখা যখন হলো,
মরণ এসে বলল হেসে
এবার তবে চলো।
যুগযুগান্ত পেরিয়ে এসে
কথার মালা সাজিয়ে শেষে,
চেনার মাঝে অচিন পাখি
হঠাৎ এল উড়ে,
পাখনা মেলে
রাতে ঘুম নিল যে সে কেড়ে।
দিন যে কখন টুপুস করে
ডুবল এসে সাঁঝের ক্রোড়ে।
যায় না ছোঁওয়া, যায় না ধরা
চকমকিতে ফুলকি ভরা।
বারে বারে আগুন ফোটে
দীপের সারি জ্বলে না মোটে।
আঁধার মাঝে হঠাৎ যখন
হৃদ-কমলে আলোর নাচন!
মরণ এসে বলল তখন,
আর দেরি নয় চলো এখন,
দাঁড়িয়ে আছে নতুন জীবন।
ছিন্ন করো, ছিন্ন করো, ছিন্ন করো জীর্ণ বাঁধন।

(বেহালা, কলকাতা)

মৃত্যু ও জীবন

শ্রাবণী চক্রবর্তী

জীবনের আলো যখন যায় নিভে
তোমার চোখের তারায়
আসে তখন মৃত্যু।
শুধু কী তাই!
পুরানো আসবাবের মতো থাকে পড়ে
তোমার বাবা-মা অবহেলায়
আসে তখন মৃত্যু।
মাতৃদুগ্ধের ধারা যখন যায় শুকিয়ে
তোমার অসাধু ব্যাবসায়
আসে তখন মৃত্যু।
দীর্ণ হয় মনুষ্যত্ব,
যৌবনের স্বপ্ন যখন যায় নিভে
তোমার দুর্নীতির ছায়ায়
আসে তখন মৃত্যু।
পথ হারায় মনুষ্যত্ব।
তবুও...
কোথাও পথের বাঁকে
শিল্পী এঁকে চলে তার ক্যানভাসে...
নতুন সূর্য, নতুন জীবনের গল্প।
হাঁটু জল মাঠে চাষি দাঁড়িয়ে,
ধানের শিষ, নতুন জীবনের গল্প।
বেঁচে ওঠে মনুষ্যত্ব।

(বেহালা, কলকাতা)

ডায়েরি

আলপনা ব্যানার্জী

ডায়েরিটা টেনে নিই লেখা জন্য
দিনের দিনলিপি রাতে লেখার জন্য
দিনে দিনে লিখছি কত কথা
আবার পড়লে সেটা ফিরে দেখা
ফিরে ফিরে যাই
দিনলিপি তাই।

সাজিয়েছি আপন সাজানো ইতিহাস
সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হয়ে সে সাহস
লিখেছি দুঃখ-বেদনা-রাগ কিংবা অনুরাগ
কখনও লেখা প্রতিহিংসার অনুতাপ
অনুরণন তোলে মনে ছোটো ছোটো ঘটনায়
ব্যথায় কুঁকড়ে যাই ঘটে যাওয়া বেদনায়।
আবার একা হেসে উঠি অট্টহাস্যে

ভাবি কেহ ভাবছে এ আমার অভ্যাসে।

নিজেকে বোঝাই
দিনলিপি লিখে যাই
পড়ব না বারে বার
প্রতিফলন আসবে তবে প্রতিবার
নিজেকে সন্তুষ্টির পথে নিয়ে
ডায়েরির দিনলিপি শুরু টেনে
আমার হচ্ছে লেখা ইতিহাস
দিনগত লেখা অবশেষে,
কোনোদিন মোটা করে বাঁধবে খাতাখানি
যদিও পড়ার জন্য না রইলাম আমি।।

(বি.টি রোড, কলকাতা)

জীবন

সুস্মিতা ত্রিপাঠী ব্যানার্জী

ঘামে ভেজা দিনের শেষে
জীবন হল টাটকা বাতাস,
আলো-ছায়ার কালের বেলা
জীবন আনে মিষ্টি সুবাস।

সৎ অসৎ-এর দাঁড়িপাল্লা
মাপছে মনের চোরা ঢেউ।
অম্ল মধুর চেনা স্বাদে
হিসেব খাতা মেলায় কেউ?

বিষাদ মাখা বারুদ বাতাস
বদ্ধ মনের কড়া নাড়া;
পিছল পথে সাবধানী মন
জীবন দীপের বড়ই তাড়া।

কারও জীবন সুখ নদীতে
স্রোতের টানে ভেসে চলে
নোনা শোকে কেউ বা ভাসে
বোবা মনে অশ্রু ঝরে।

তবুও জীবন আমার তোমার
সবার কাছে বড়ই আপন,
জীবন মঞ্চে পালা চলে
সাঙ্গ হলেই সমাপতন।

(বড়িশা, কলকাতা)

দুটি কবিতা

প্রতীপ মুখোপাধ্যায়

নরকের কীট

দোজখ্-এর রাস্তা থেকে যে রাস্তাটা একটু বেঁকে ওই তো
যেখানে এসে হাঁফ ছাড়ল-ওটাই বেহেস্ত!
ওখানে নির্জন অবকাশে আসা যেতেই পারে;
শুধু নরকের কিছু কীটদের এনো-না
ওরা থাক ওধারে!
কিছুটা হাঁটাপথের কায়িক শ্রমের দূরত্বে,
অবদাত এক মনাস্ট্রি-
ইমন রাগে বেদনা-বিধুর তার স্থিতি!
হাড়-হিম ঠান্ডা আর রিমরিম সুরে বাতাবরণে...
বাতাস স্নিগ্ধ বেহেস্ত!
পুণ্য-স্নান সেরে নাও তিযাম্পতির আহ্বানে-
পূজা দেবে তো দিয়ো প্রকৃতি চরণে!
মনুষ্য-রূপী কিছু কীট এসব আলোকিত মাহাত্ম্য-
না বুঝেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগে নিজেদের জেহাদ
ঘোষণা করতে আসে...
ফলস্বরূপ দোজখ্-এর অনাচারে বেহেস্ত-এর নানা দিক
কলুষিত ভূষিত কণ্টকে!
তাই বলছিলাম; জেনে-বুঝে এনো না সঙ্গ করি তাদের!
আকাশের সীমা তোমার কালিমা মুছিয়ে দিক;
বৃক্ষ-সুষমা তোমার শরীরে করুক সংযত মানসিকতায়
ধৌত!
এসো, যাও-
তোমার জন্য অনবদ্য-ভূমিকায় দিন গুনছে,
অমর-প্রকৃতি!

বলছি

উন্মেষ পর্বে; চিত্ত কুঠুরির মৃদু আলো... তোমাকে দিলাম!
কাঞ্চন-শোভিত শুভ্র-শৃঙ্গ অনায়াসে কাছে আনলাম।
শুধু তোমার জন্য; করায়ত্ত এসব আমার অনেক পরিশ্রমে;
আমিও চাই-এষণা লগ্নে তুমি ফুটে ওঠো রক্তকরবী হয়ে,
গভীর নিবিড়ভাবে।
সর্ব অঙ্গে বিষ অথচ ভয়ানক সুন্দর আলংকারিক বিভাবে!
আমার স্পর্শ; তোমার উন্মুখ-চেতনায় দেবে দোলা,
বিষের ছোঁয়া নিমেষে যাবে উবে রক্তিম বাসনায়...
আমি যে পথ ভোলা!
ভুলেছি পথ তবু মেনেছি জীবনের সত্য ...
তোমার দুয়ারে রাখা আমার এই সামান্য মহত্ত্ব।

(নিউ আলিপুর, কলকাতা)

পিকনিকে হঠাৎ দেখা

কল্যাণ কুমার সুর

পিকনিকে হঠাৎ দেখা। এক কোণে বসেছিল চুপচাপ,
শান্ত অথচ দৃপ্ত চাউনি,
শেষের কবিতায় লাবণ্যর কথা মনে পড়ে গেল,
শুনলাম, সে একজন বাচিক শিল্পী।
এবারে এল, তার কবিতা বলার পালা,
বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও সুন্দর পরিবেশনায়
মুগ্ধ করল সকলকেই,
শেষ বিকেলের গোধূলি আলোয়
তার সৌন্দর্য আর মুগ্ধতা
ছড়িয়ে দিল বসন্তের বাতাসে...!
আচমকাই মনে পড়ে গেল, ডালটনগঞ্জ রেলস্টেশনে
হলুদ টাঙ্গাইল শাড়ি পরা এক নববধূর
নাকের ওপর সিঁদুরের ছিঁটে।
পিকনিক শেষে, ঘরে ফেরার পালা।
একরাশ বেদনাবিধুর ভালোলাগার আবেশ, মুহূর্তেই যেন
নাম না-জানা সুগন্ধী ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ...
সে ফুল কুড়িয়ে নিয়ে অস্ফুটে শুধু বললাম,
'ভালো থেকো'।

(বেহালা, কলকাতা)

জুয়া

চিরপ্রশান্ত বাগচী

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর চাঁদের আলো
এমনই প্রতিবিম্বিত ছিল সমুদ্রে...
যেন তৈলচিত্র। না কি অগণন রঙিন কাচের টুকরো!
লঘু পায়ে এগিয়ে চলি অপেক্ষমাণ গাড়ির দিকে।
এগিয়ে? না কি সৈকতে বিছিয়ে রাখি নকশিকাঁথার মতো
কিছু রক্ত-রাগের বৃত্তান্ত
ঘামের ব্যঞ্জিত গন্ধ আর প্রশ্ন ও বিস্ময়ের
অন্ধকার সংলাপ?
সমুদ্র-সম্পদের সেই শহর...
সূর্য ডুবলেই যেখানে যৌন মুহূর্তের কাউন্টডাউন...
অন্তর্হিত দারিদ্র্য, মোমো, পপকর্ন, কফি
আর পানীয়ে অক্ষয় তারুণ্য...
লবণাম্বুর সেই গভীর আকর্ষণ, না কি মায়া-মৃগের আহ্বান....
এত সব ভাবোনি তুমি।
দিবারাত্রি শুধু অলৌকিক গণন-যন্ত্রে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তম
সংখ্যা ভিতর তোমার আত্মা দোদুল্যমান।
যেন জুয়ার পছন্দসই সংখ্যা শুধুই আগে-পিছে!
তবু ভুল করে ভুল পথে পা বাড়াওনি।
এমনই লঘু-মুহূর্তের কথা অনেক দুঃখের ভিড়ে
বারবার সেজানের হাতের ছোঁয়ায় ধ্রুপদি হয়ে ওঠে।

(সাহাগঞ্জ, হুগলি)

একসাথে

চয়নকান্তি দাস

আর কত বসে থাকি একা...
বসে বসে গুনতে থাকি তারা।
ভিড় করে আসে এক এক প্রজন্ম,
এলোমেলো করে দেয় এক ভাইরাস।
কেন এই দোলাচল?
সভ্যতার সবথেকে শক্তিশালী এই মানব।
আর একা একা বসে থাকার সময় নয় তাই,
ভেঙে ফেলো প্রাচীর...
খুঁজে নাও ওই দোলাচল।

মানুষের কাছে গিয়ে,
চিৎকার করে বলো সতর্ক হও, মেনে নাও সহজ জ্ঞান-বিজ্ঞান
আঘাত করো গভীর থেকে গভীর ষড়যন্ত্রে।
ভেঙে যাবে প্রাচীর।
শপথের নুড়ি খুঁজতে খুঁজতে তাই বাঁচব।
তবে একা নয় একসাথে।

(বেহালা, কলকাতা-৩৪)

দুটি কবিতা

জয়ন্ত সুকুল

মহুলটাঁড়ের ফুলমতী

হাঁটুর ওপরে তার কাপড়
বিপিএলের শরীর
সে অনায়াসেই
কাঠের অস্ত্র দিয়ে
মুছে দিতে পারে
জীবনের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি।
দেশ জুড়ে সন্ত্রাসের
বিতর্ক বোঝে না সে-
অন্ধকারে সে শুধু দ্যাখে
পুড়ে যাচ্ছে মহুলটাঁড়ের
নিরন্ন মানুষ!
ফুলমতী দশভুজা হতে চায়
হতে চায় শ্রাবণ সন্ধ্যার
অঝোর বৃষ্টির গান।

স্বপ্নের পাণ্ডুলিপি

দুরে আছি, আছি অলীক সম্মোহনে
তাই তো আগুনে পোড়ে না মৌতাত,
অনিচ্ছার সুখে ভাঙে হৃদয়ের রক্তকরবীর বাঁধ
তবুও তোমাকেই শুধু ডাকি সতর্ক লজ্জায় অকস্মাৎ।

দুরে আছি, তাই দেখিনি কোনোদিন বনানীর জোয়ারভাটা
কত দূরে পাতা আছে রাত্রির শয্যা সব
দিনমান যেন মনে হয় শুধু দুঃখের বিষাক্ত কাঁটা।

দূরে আছি, তাই অদেখাই তোমার যৌবনের চিত্রপট
দেখিনি মায়াময় গোধূলির ধুলো-খেলা,
আর অন্ধকার রাত্রির জ্যোৎস্না-মাখা অশ্বত্থ-বট।

দূরে আছি, তাই নদীর জলে ভেসে যেতে দেখি
স্বপ্নের পাণ্ডুলিপি আর অচেনা চাঁদের ছায়া
যে-ছায়া ভেঙে দিতে পারে পার্থিব অলীক মায়া!

(বেহালা, কলকাতা)

মুরশিদাবাদ

শুভশ্রী সরকার

স্মৃতি বিজড়িত পথ জানি তার নিয়ে চলে কোন্ খানে,
ভাগীরথীর দুই পার জুড়ে,
ইতিহাস কথা বলে।
ভাঙা কেল্লার ভাঙা স্তম্ভ, গম্বুজের সুউচ্চ ছাদ,
ইট-কাঠ-পাথরের ফাঁকে
কত গল্প ভাসে দিন-রাত।
কত মানুষের চোখের জলের কত দাগ রয়েছে লেগে,
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চোরাবালিতে
ইতিহাস আজও জাগে
কাটরার রাঙা ইটের খাঁজে, রানি ভবানীর মন্দিরে,
হাজারদুয়ারি, মতিঝিল আর দুঃখের খোশবাগে;
ডুবন্ত ওই হীরাঝিল, লাগোয়া সতী পিঠস্থান,
কাঠ-গোলাপের বাগানবাড়ি,
'কলিজাখাকি'র বাগান।
ফুটি মসজিদ যেন গিয়েছে মিলিয়ে সময়ের চোরা স্রোতে
মন তাও খুঁজে ফেরে কাহিনি,
কবে কার কোন্ সে কালের।
লেখা হয়নি সেসব কিছু, গাঁথা হয়নি কোনো গাথা,
ভাঙাগড়ার হিসেব লেখে নদী,
বুকে নিয়ে শতেক ব্যথা।
কত রথী-মহারথী গিয়েছে চলে, নেই সে কালের লোক,
রয়েছে পড়ে ভাঙা পিঞ্জরে

অজস্র বেদনা আর শোক।
সন্ধ্যাকালে জ্বলে ওঠে আলো,
ঢেউয়ে ভাসে ভবনের প্রতিমূর্তি,
ইতিহাসের করুণ কাহিনি নিয়ে
সাক্ষী থাকে ভাগীরথী।।

(আলিপুর, কলকাতা)

দুটি কবিতা

রাজু হাজারী

নীবর কেন ফাগুন তুমি

নীবর কেন...ফাগুন তুমি
লাগাও আগুন অন্তরে,
দখিন দুয়ার ...দিলাম খুলে
প্রেমের কুহু মন্তরে।

অশোক পলাশ... গাইছে যে গান
নীল আকাশে ঢেউ তুলে,
রঙের খেলায়...মন মেতেছে
দুঃখ সকল আজ ভুলে।
প্রাণ ফিরেছে... গাছের শাখায়
সবুজ রঙের খেলাতে,
আমের মুকুল...ঝরছে দ্যাখো
হালকা হিমের মেলাতে।

ডাক দিয়েছে...নতুন বছর
নতুন রূপের আলোকে,
দুঃখ সকল...দাও না মুছে
যাও না ভুলে কালোকে।

অতঃপর একটি নতুন মৃত্যু

অবসাদে পড়ে রয় দেহ,
যা অজানা তা না হয় অজানাই থাক,
বাইরের জানালা খোলা
ভিতরটায় অমানুষিক এক যন্ত্রণা।
প্রেমিকের ব্যর্থ প্রচেষ্টা শুধু পড়ে রয়
বয়ে বেড়ায় প্রতিটা খুনি মস্তিষ্ক
শুধু এক চিৎকার হাহাকার ভেসে বেড়ায় বাতাসে,
ক্ষণিকের যন্ত্রণায় খুন হয় মন
শুধুই অশান্তি, শুধুই অশান্তি।
কেউ কারও নয়, বারংবার শোনা যায় চিৎকার
কোনো জীবিত কবরের পাশে,
কে এই জীবন্ত কবর? কেন এই হাহাকার?
কেউ খোঁজে না তার কারণ
শুধুই যন্ত্রণা, শুধুই যন্ত্রণা।
প্রতিকারে যায় না ছুটে কেউ
দেয় না ভালোবাসা, বৃথাই সান্ত্বনা, বৃথাই বেঁচে থাকা
অতঃপর একটি নতুন মৃত্যু।

(ঠাকুরপুকুর, কলকাতা)

লতাজি

তপন আইন

মৃত্যু এসে দরজার কাছে দাঁড়াল, মাথা নীচু করে।

লতাজি বললেন, 'দূরে কেন? কাছে এসে বোসো'।
ঘরময় কান্নার শব্দ শুনে বললেন, 'সে কী! তুমিও
কাঁদছ!'
গুটি গুটি পায়ে এসে, লতাজির শয্যার কাছে নতজানু
হ'ল সে,
বারবার মাথা নেড়ে বল, 'আমি পারলাম না, আমি
পারলাম না'।
লতাজি নীরবে মৃত্যুর দিকে চেয়ে রইলেন,
মুখে তার অমলিন হাসি, বললেন, 'কী পারলেনা তুমি'?
মৃত্যু বলল, 'আমাদের স্বর্গে তো টিভি নেই, মিউজিক
সিস্টেম নেই।
রেকর্ড প্লেয়ার নেই, ক্যাসেট নেই, সিডি নেই, কিচ্ছু নেই
কী করে আপনার গান আমি স্বর্গের দেবদেবীদের
শোনাব?
এবং একথাও বলব, গান কাকে বলে শুনুন, সুর কীভাবে
লাগাতে হয় অনুভব করুন।

আপনারা দেবদবীরা কিন্নর কণ্ঠী হয়েও
সারা বিশ্বকে মোহিত করতে পারেননি,
যা, মর্তভূমির সামান্য এক নারী অনায়াসে তা করে
দেখালেন।
আমার ইচ্ছে ছিল জীবিত অবস্থায় আপনাকে
স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার, পারলাম না, আমি পারলাম না'।

লতাজি সস্নেহে মৃত্যুর মাথায় হাত রাখলেন
গুনগুন করে গাইলেন, 'নাম গুম হো যায়েগা ...
একটু থেমে আবার গাইলেন,
কোনো রাতে মনে কী গো পড়বে,
ব্যথা হয়ে আঁখি জল ঝরবে' ...

নিঃশব্দে, নিথর লতাজির চরণ ছুঁয়ে বসে রইল মৃত্যু।

(সন্তোষপুর, কলকাতা)

দুটি কবিতা

অমিতাভ কুন্ডু

পথ চলা

যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তোমায় ভরা জোছনায়
অনুভূতি আমার হয়েছিল বিদেহী
আকাশ ভরেছিল তোমার উজল গভীরতায়
শুরু হয়েছিল আমাদের পথ চলা।

তারপর আলো আঁধারির এক দীর্ঘ অববাহিকা
ভালোবাসার লড়াই শুরু অভ্যাসের সাথে
নির্মম মুহূর্তগুলি পিষে দিল প্রেমের সূক্ষতাকে
হতাশার বাতাসে বয়ে যায় চারদিকে।

আজ এই জীবন নদীর মোহনায় শুধুই নীরবতা
ব্যর্থতাই রয়ে গেছে ভাগশেষে হয়ে আজ
না-পারার যাতনা ভরা এক-একটি পল
ওঠে নতুন একটি ফুল হয়ে।

মুক্তির খোঁজে

শুকনো পাতার মতো উড়ে যায় এক-একটি দিন
মুক্তি আজও হাতছানি দেয়, সে ডাক অমোঘ
নিত্য পূজাপাঠে ব্যস্ত আমরা খুঁজে বেড়াই, হয় বিলীন
আমাদের এত প্রার্থনা, আকাঙ্খা
মুক্তি তবু থাকে দুরে।

মুক্তি নেই অবিরাম পুজাপাঠে
মুক্তি নেই মিথ্যা এই পূজার নামে পুতুল খেলাতে
ধূপ, প্রদীপ জ্বালিয়ে মিথ্যা এ বিশ্বাস প্রদর্শনে

কোথায় মুক্তি তবে?
সে তো আছে আমাদে নিত্য সৎ জীবনের ফাঁকে
সে তো আছে ত্যাগ-এ, সবকিছু আছে যা ঈশ্বরের দান
তা নিরলসভাবে-এ বিলীন করে অভাগা মানুষের মাঝে।

(নাগের বাজার, কলকাতা-২৮)

দুটি কবিতা

নিরাশাহরণ নস্কর

মেঘপিয়োনের চিঠি

শাওন রাতের স্মরণ জুড়ে মেঘবতীর আগুনঝরা ফ্রক
স্বপন সাজায় বন্যা উথাল সোহাগ ভরে ভোলায় কুসংশ্রব
সারারাত প্রেমাবেশ ঝিরিঝিরি টুপটাপ কথা
মাঝে মাঝে মল্লারে মুছে যায় পাপ আবিলতা
খুঁজে পাই পরিচয় ভেসে যায় সব ঘরদোর
বাউলমন বিবাগী হয় ঘনাঞ্জনে দারুণ প্রেম ঘোর।

শাওন

শাওন মানে আকাশ ভরা রজঃস্বলা মেঘ
বৃষ্টি ঝরায় হৃদয়পুরে ভাসি অনিকেত
শাওন মানে ছন্দমাখা সুর ঝরানো বাঁশি
নূপুর বাজায় স্কুল বালিকা ছোট্ট সুখের পাখি
শাওন মানে উথালপাথাল স্বপ্ন স্মৃতির বন্যা
কল্পনাতে প্রথম প্রেমের বিদেহী সেই কন্যা।।

(বারুইপুর, দ ২৪ পরগনা)

আমি কে

পূবালি চক্রবর্তী

মানুষরূপী যন্ত্র আমি
লাগি সবার কাজে।
তবু আমার ঠাঁই নেইকো
কারও মনের মাঝে!
যার যখনই হয় প্রয়োজন
পড়ে আমার ডাক,
কাজ ফুরোলেই দেখি তখন
সবই চিচিংফাঁক।
ভাই বলো, বন্ধু বলো-
এমনকী, নিজের ছেলে,
ফুরিয়ে গেলে স্বার্থ তাদের
যায় আমাকে ফেলে।
কথায় কথায় দেয় উপদেশ-
আর গঞ্জনাও কত শত,
প্রাপ্য আমার হয় যে সে-সব
দিনরাত অবিরত!
হাবেভাবে বোঝায় তারা
নানা অজুহাতে,
আমি ওদের কেউ নয় যে
বাতিলের খাতাতে।
এত বোকা আমি দয়াল
কখনও বুঝিনি,
জীবন কেন নিঠুর এমন
কেনই-বা জারিজুরি-
(সকলের) ছলচাতুরীর প্যাঁচে পড়ে
ফুঁপিয়ে কেঁদে মরি!

(জয়শ্রী পার্ক, কলকাতা)

চিঠি

অসিত পালিত

হোয়াটস্ অ্যাপ-তে পাঠিয়ে
দিলাম, চিঠি আজ।
বন্ধু আছি অনেক দূরে-
হাতে অনেক কাজ।
এটিই এখন তৃতীয় হাতের রাস্তা
এটিই সবার পন্থা।
এভাবেই বাঁচাই আমরা
সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা
তবুও আমি পাশেই আছি
হাজারো কাজের মাঝে
সব সময়ে সকল কাজে
আছি তোমার পাশে।
ব্যস্ততার এই জীবনেতে
সবাই খুবই একা
এটাই এখন নিয়ম যে তাই
এটাই কালের প্রথা।

(বেহালা কলকাতা)

ভালোবাসা

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

তোমার ভালোবাসা কি ইচ্ছে ডানা মেলবে?
উড়বে আমার সুরের আকাশে...
আমি জানি না!
তোমার ভালোবাসা কি ঝরনা হবে?
মিলবে আমার কামনার নদীতে
আমি জানি না!
তোমার ভালোবাসা কি স্বপ্ন হবে?
দুলবে আমার চোখের তারায়
আমি জানি না!
তোমার ভালোবাসা কি অমৃত হবে?
আমাকে মৃত্যুঞ্জয় করবে
আমি জানি না!

(খড়দহ, উ ২৪ পরগনা)

বিবর

শমীক রুদ্র

আলো-
ক্রমশ ফ্যাকাশে,
ডানা শব্দে

ভারি বাতাস,
ফেরার বন্ধন দৃঢ়।
ক্যানভাসে
চেনা ছক-
উল্লাস।
একা ঘরে
কান্নার আশ্রয়।
নিঃসৃত
নতুন মন খারাপ।
সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত-
ভারী ধাতব শব্দ।
গভীরে,
আরও গভীরে
একাকী ক্লান্ত বন্দরে-
নোঙর নামে ধীরে।।

(পূর্বপুটিয়ারি, কলকাতা)

খাঁটি আশ্রয়

উজ্জ্বল ভট্টাচার্য্য

একঘেয়েমির ব্যস্ততা থেকে মুক্তিলাভে সবারই
ইচ্ছে জাগে ভ্রমণে,
অনেক আগামী দিনগুলির জন্য শক্তির
রসদ জমে মনে।
নতুন প্রাকৃতিক, ভাস্কর্য শিল্পের মুখোমুখি
থেকে বোধ হয় স্বাচ্ছন্দ্য,
অন্য ধরন পরিবেশে হোটেলের রান্না খেতে খেতে
গড়ে ওঠে মজার ছন্দ।
একটু অতিরিক্ত সময় ঘরের বাইরে থেকে
অন্তরে ক্রমে বাসা বাঁধে ক্লান্তি,
তখনই কতক্ষণে স্বগৃহে ফিরে আসব সেই
ভাবনাতেই শুরু শান্তি।
একটুও চলে না তুলনা বারোমাস নিমিত্ত
নিজের ঘরের সাথে,
শৈশবের কত ভালোলাগার স্মৃতি আছে হৃদয়
অভ্যন্তরে গেঁথে।
এর মতো কীই-বা আছে, বাড়ির আশেপাশের
বন্ধুবান্ধব চেনা পরিচিতদের সঙ্গ,
গল্প, আড্ডার আসরে ঘুরেফিরে হয়তো একই প্রসঙ্গ।
আর বাড়ি যদি হয় একান্নবর্তী পরিবারের ব্যবস্থা,
বিপদেআপদে সবার উপস্থিতি জোগায় বড়ো আস্থা।
ভীষণ প্রীতিকর পরিস্থিতি সকালে যে-যার
কর্মযজ্ঞে যাওয়ার সময় 'মা' শ্রেণির মানুষগুলোর
দুর্গা দুর্গা নাম,
তাঁদেররই হাতে বানানো টিফিন বাক্সে ভরতি খাদ্য
যা ছাড়লেই লোকসান-রসনা তৃপ্তিতে জানাই
প্রস্তুতকারকদের জন্য প্রণাম।
রাতে ঘরে প্রবেশমাত্রই প্রাণাধিক প্রিয়জনদের
উপস্থিতিতে শব্দ বিনিময় আলপী ঢঙে,
যেখানেই যাওয়া হোক-না কেন, দিনান্তে
প্রতীক্ষায় অভ্যস্তদের পেয়ে শরীর টগবগে রয়
পছন্দের রঙে।

(চন্দননগর, হুগলী)

দুটি কবিতা

প্রভাতী ভট্টাচার্য্য

প্রকৃত প্রেম

প্রকৃত সে প্রেম একবারই আসে, আসে না তো বারবার,
সেই প্রেম স্মৃতি সুধাসংগীতি মধুময় অনিবার।
ভালো লাগবার প্রথম সে ক্ষণ কপোলে লালিমা আভা,
আড়চোখে চাওয়া আড়ালে তাকানো হৃদয়ে প্রেমের প্রভা!
মনে মনে শুধু গুনগুন গান, ভাষাহারা মনপ্রাণ,
স্বপ্নের ঘোরে বিভোর মায়ায় দিন হয় গুজরান।
দূর থেকে শুধু চোখে চোখে চাওয়া, চোখে চোখে কথা বলা
কাছে আসবার আকাঙ্খা মনে শঙ্কায় পা ফেলা।
আত্মপ্রকাশে ভীত অন্তরে নিজেকে আড়ালে রাখা,
দুরুদুরু বুকে ভালোবাসা সুখে অলীক মাধুরী মাখা।
সেই প্রেম আসে মধুর আলসে অলক্ষ্যে অজানায়,
স্থিতিকাল তার হয়তো সীমিত অকালেই চলে যায়!
শাখা ভরে যায় কোরকে কোরকে ফোটে না সকল কুঁড়ি,

অসময়ে তার ঝরে পড়ে কত হিসেব কে রাখে তারি।
মনের শাখায় প্রথম প্রেমের সেই কলি আজও ফোটে,
স্বপ্নমায়ায় আজও সে সতেজ অন্তর ভরে ওঠে।

সময়ের ঠিকানায়

একদিন থেকে প্রতিদিন হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দিন,
একপল থেকে মুহূর্ত পার সময় সে সীমাহীন।
সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা পেরিয়ে মাস বা বছর শেষ,
দশক, শতক, সহস্র হয়ে মহাকালে জমা ক্লেশ।
ঐতিহাসিক সময় নিরিখে মাপকাঠি আছে রাখা-
অতীতের যত কাহিনি বুনটে ভবিষ্যতকে দেখা।
মাঝখানে আছে দণ্ডায়মান বর্তমান-এর ছবি;
অনিত্য নিয়ে নিত্য দ্বন্দ্ব অগ্রাধিকার দাবি।
সময়ের স্রোতে বইছে সতত ধরাতো যাবে না তাকে,
অনুপল থেকে সহস্রপল দাম নিতে হবে শিখে।
নষ্ট সময় চলে গেছে যাক আফশোশ কি-বা তাতে,
মূল্যটা পাক সেই সময়টা যেটুকু রয়েছে হাতে।
সুসময় আসে চলেও সে যায় অসময় সেও আসে,
রসময় তিনি সদাই থাকেন উদাসীন অনায়াসে।
সময় থাকতে সময়ের দাম হয় না কখনও দেওয়া,
অকারণ কিছু তুচ্ছ কর্মে অপচয় করে যাওয়া।
আজ আর কাল সকাল-বিকাল দিন ও রাতের পালা,
সময়ের কথা বোঝাবে সময় সময়কে হবে ভোলা।

টরনটোর আশু পুরোহিত

ড. গৌতম ভট্টাচার্য্য

ক্যানাডার টরনটো শহরের এয়ারপোর্ট থেকে যদি হাইওয়ে দিয়ে শহরের দিকে যান, তাহলে মাঝখানে অনেক মাইল ধরে বেশি জনবসতি নেই, শুধু বড়ো বড়ো গুদোমঘর, কারখানা, পাইকারি আড়ত, গ্যারাজ এইসবের মধ্যে কতকগুলি পুরোনো দিনের চাষিদের পাথরের বাড়ি আছে, সেইগুলো সংস্কার করে কিছু অফিস বা বাড়ি বানানো হয়েছে।

ওইখানেই একটু ভেতরের রাস্তায় দেখবেন একটা পাথরের বাড়ি, খুব সুন্দর করে সারানো হয়েছে, একটা বড়ো গেটের পাশে বসে আছেন সাদা চুল আর দাড়ি নিয়ে পাঞ্জাবি এক দাদু। দাদুর কাজ হচ্ছে বোতাম টিপে গেট খুলে দেওয়া। একটা বড়ো সাইন বোর্ডে লেখা Choutala's Truck Garage and Truck Parts Shop।

বাড়ির পেছনেই একটা ট্রাকের গ্যারাজ আর তারই সঙ্গে একটা Junkyard, সেখানে ভেঙে যাওয়া লরির নানা রকম যন্ত্রপাতি থাকে। জাঙ্কইয়ার্ড-এর ব্যবসা ভালোই, অনেকে পুরোনো ট্রাকের রেডিয়েটর, কারবুরেটর, এমনকি ইঞ্জিন পর্যন্ত কিনে নিয়ে নিজেদের ট্রাকে লাগায়। ওই জিনিসগুলো অবহেলায় মাটিতে পড়ে থাকলে কী হবে, ওদের দাম অনেক।

ওই পাথরের বাড়িতে থাকেন মিস্টার প্রকাশ চৌতালা - হরিয়ানার লোক, কুস্তিগিরের মতো চেহারা, আর ওর স্ত্রী মধু (যার কথায় পরে আসছি), ওদের কিশোরী মেয়ে আর দাড়িওলা বুড়ো-প্রকাশের বাবা। ওই বাড়ির পাশে একটা পুরোনো খামার বাড়িকে সারিয়ে করা হয়েছে বাল্মীকি মন্দির, চৌতালা সাহেবের ট্যাক্স বাঁচানোর জন্যেই হবে হয়ত। ভেতরে বাল্মীকির মূর্তি, রামায়ণ লিখছেন, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এঁরাও আছেন, দেওয়ালে রামায়ণের বিভিন্ন রকমের ছবি আঁকা।

মন্দিরের পুরোহিত আশু ব্যানার্জী, একদম পশ্চিম বাংলার টাকি শহরের কাছে, ইছামতি নদীর ধারে একটা ছোটো গ্রাম থেকে এসেছে। কী করে এল সেটা অনেক জটিল গল্প, এখানে আর বলছি না। আশুর বাবা অনেক ছোটোবেলায় মারা গেছেন, কিছু জমি আছে তার থেকেই ওর মায়ের আর ওর মোটামুটি চলে যেত। আশু নিজেই পড়াশুনা শিখেছে ভালোই। কলকাতায় থাকলে আশু হয়ত ভাষাবিদ হত, টাকির মতো জায়গাতেও ইংরেজি বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত খুব মন দিয়ে শিখেছে, টাকি কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বিএ পাস করেছে। পুরোহিতের কাজ নিয়েছে সুযোগ পেয়ে, আসলে কিন্তু আশু খুব একটা ধার্মিক নয়। বিয়ে করার ইচ্ছে আছে খুব। কিছু টাকা জমলে দেশে ফিরে গিয়ে সংসার করার প্ল্যান।

মন্দির আর চৌতালার বাড়ির পিছনেই হচ্ছে জমি নিয়ে জাঙ্কইয়ার্ড, লরির পার্টস ছড়িয়ে আছে, আবার গোটা দশেক লরির ওখানে রাত্রের গ্যারাজও আছে। রাত্রিতে পুরো জায়গায় তালাচাবি লাগান হয়, চারটে বড়ো রটওয়েলার কুকুর ভেতরে ছেড়ে দেওয়া হয়, কেউ ঢুকলেই শেষ করে দেবে। জাঙ্কইয়ার্ডের ঠিক মাঝখানে একটা ছোট্ট কটেজ, সেখানে থাকে গাঁজাখোর ক্যানাডিয়ান বিলী।

বিলীর মাথাটা পুরো নরমাল নয়, আবার একটু খোঁড়া, বয়েস তিরিশের বেশি, ও কুকুরগুলোকে খাওয়ায় রোজ। কুকুরগুলো ওর কথাই শোনে শুধু। ওরা দিনেরবেলা বিলীর ঘরের পাশে বেড়ার মধ্যে আটকে থাকে, বেশি চ্যাঁচামেচি করে না। আর বিলী গ্যারাজটার একটু দেখাশোনা করে দিনের বেলায়, খদ্দেরদের সাহায্য করে, ড্রাইভারদের সঙ্গে গল্প করে, বাকি সময় গাঁজায় দম মেরে বুঁদ হয়ে থাকে।

মন্দিরের পেছনেই একটা ছোটো ঘরে আশু থাকে। তখন ও যা মাইনে পেত তাতে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ কিছুই কিনতে পারেনি। ঘরে শুধু একটা বিছানা, একটা ছোট্ট টেলিভিশন আর একটা টেবিলে অনেক বই-সপ্তাহে একদিন চৌতালা সাহেব ওকে গাড়ি করে লাইব্রেরি নিয়ে যান, আশু অনেক বই ধার নেয়, আর লাইব্রেরির ইনটারনেট থেকে নানা রকম খবর পড়ে।

যদিও আশুর মাইনে কম কিন্তু মন্দিরের কাজও বেশি নয়। আশু সকালবেলা মন্দির পরিষ্কার করে খুলে দেয়, ছোটো করে একটা পুজোর পরে দুপুরের প্রসাদ ও নিজেই বানায় ফল আর মিষ্টি দিয়ে। টরনটো বিশাল শহর, দুটো মস্ত বড়ো মন্দির আছে, ছোটো মন্দির আছে

অনেকগুলো। ফলে আশুর পুঁচকে মন্দিরে দিনেরবেলা খুব একটা কেউ আসেন না।

সন্ধ্যেবেলায় বড় করে পুজো, আরতি এইসব করে আশু। সপ্তাহে তিনদিন রামায়ণ পাঠ হয়, তার মধ্যে একদিন মূল সংস্কৃত বাল্মীকি রায়ায়ণ থেকে আশু পড়ে, বেশ কিছু লোক শুনতে আসে।

সপ্তাহে চারদিন একজন ভারতীয় রাঁধুনি এসে ভোগ রান্না করে দিয়ে যায়, অল্পসংখ্যক লোকই আসে, চৌতালার পরিবার ছাড়া। পুরি, সবজি, মিঠাই সব থাকে -খেতে ভালোই।

এই সুন্দর পুণ্যের জীবনে কিন্তু মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটায় বিলী। গাঁজা, মদ, সিগারেট সবই বিলি আশুকে অফার করে। মাঝে মাঝে বিলী ওর বাড়ির বাইরে গ্রিলে আগুন জ্বালিয়ে বিফ, শুয়োর কত কিছু বারবিকিউ করে। এইসব লোভ আশুকে সামলাতে হয়।

কিন্তু মধু? চৌতালার বউ মধু, বাড়ির পেছনে বেরোয় হামেশাই, গরমকালে শর্টস আর হাত-কাটা জামা পরে, অন্য সময় টাইট জিনস আর গেঞ্জি পরে। ফুলগাছে জল দেয়, বাগানের যত্ন করে, বা মাঝে মাঝে বাড়ির পেছনের চাতালে বসে আরাম করে। বিলী আর আশু হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মধু চৌতালার বয়স ৩২/৩৩ হবে, মুখ, চোখ একেবারে কারিনা কাপুরের মতো, আর শরীরের গঠন কারিনা কাপুরের থেকেও ভালো। ওকে দেখে গাঁজাখোর ক্যানাডিয়ান বিলী আর টাকির পুরোহিত আশু দুজনেই কুপোকাত। যখন সেজেগুজে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যায়, আশু জানালা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, আর-একটা ধবধবে সাদা কামিজ পরে যখন মন্দিরে ভোগ খেতে আসে, তখন আশু আর চোখ ফেরাতে পারে না। মাঝে মাঝে মধু আশুর সঙ্গে একটু গল্প করে, আশু তখন তোতলাতে শুরু করে দেয়। মধু তা শুনে মিটিমিটি হাসে।

বিলী মধুকে দেখে আর বলে What a fabulous MILF, man!! আশু ইনটারনেট থেকে MILF কথাটা শিখে নিয়েছে, ও বিলীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত!

এইভাবেই বেশ চলছিল, আশুর প্ল্যান ছিল পাঁচ বছর কাজ করে, টাকাপয়সা নিয়ে টাকিতে ফিরে যাওয়া। একদিন রাতে সব এলোমেলো হয়ে গেল।

তখন রাত প্রায় নটা, হঠাৎ আশু শোনে চৌতালা সাহেবের গলা। ও নিজেই নিজের লরি চালিয়ে গ্যারাজে ঢুকছে, আর বিলীকে ডাকছে খুব জোরে। বিলী ছুটে গিয়ে আগে কুকুরগুলোকে আটকে দিল, তারপর পাটাতন আর মই লাগিয়ে দিল লরির পেছনে। আশু দেখে অবাক। গ্যারাজের মধ্যে তো শুধু গাড়ি পার্ক করা হয়, মালপত্র (কার্গো) এখানে আসার কথা নয় তো।

লরির পেছনেরর দরজা খুলে গেল, আর প্রায় ষাট জন ভারতীয় চেহারার মানুষ নেমে এল। সবাই সোজা আশুর মন্দিরের চাতালে এসে বসে পড়ল। প্রত্যেকের পরনেই নোংরা জামা আর চান না-করার জন্য ভীষণ গন্ধ-আশুর প্রায় বমি উঠে আসে আর কী।

হাসিহাসি মুখে চৌতালা সাহেব এলেন, আশুকে বললেন 'এই লোকগুলো এখানে দুদিন থাকবে, তারপরই চলে যাবে, তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই'।

আশু বলল, 'এটা স্যার বাল্মীকির মন্দির, পবিত্র জায়গা, এখানে এইসব কেন করছেন'?

চৌতালা সাহেব উত্তর দিলেন 'গুলি মারো পবিত্র জায়গায়, ওরা এখানেই থাকবে, চান করবে মন্দিরের জলে, জামাকাপড় পরিষ্কার করবে। তুমি যদি সাহায্য কর, তোমাকে খুশি করে দেব, নইলে তোমার চাকরি হয়ত চলে যাবে, শরীরের ক্ষতি হওয়ারও সম্ভাবনা আছে'!

আশু খুব নিরীহ লোক। কিন্তু এইসব শুনে ওর মাথা গরম হয়ে গেল।

'এটা বাল্মীকি মুনির মন্দির, আর আমি এর পুরোহিত, এখানে আমার কথাই চলবে। আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে যান'। এই বলে মন্দিরের ভেতরের দরজা বন্ধ করে ওর ঘরে চলে গেল রাগে কাঁপতে কাঁপতে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে, আশুর মাথাটা ঠান্ডা হল একটু, ভাবতে শুরু করল কী করা যায় এখন। সেই সময়ই ওর দরজায় টোকা পড়ল। ভয় ভয় দরজা খুলে দেখে ওমা এ তো মধু এসে গেছে। প্রচুর পারফিউম লাগিয়েছে, আর সেই সেক্সি সাদা জামাটা পরে আছে। ওপরের দুটো বোতাম আবার খোলা।

ওর হাত ধরে মিষ্টি হেসে মধু বলল "এইসব

ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছ কেন? চলো আমি আর তুমি নায়াগ্রা ফলস চলে যাই। আমার গাড়িতে করে যাবে, একটা হানিমুন সুইট ভাড়া নেব। দু-দিন ওখানে থাকবে আমার সঙ্গে। যখন ফিরে আসব, সব ঝামেলা মিটে যাবে।

'আর মিস্টার চৌতালা'? আশু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

খিল খিল করে হেসে মধু বলল 'আরে প্রকাশই তো আমাকে বলল তোমাকে নিয়ে যেতে। ফিরে আসার পরে ও তোমাকে একটা বিরাট বোনাস দেবে। যাও রেডি হয়ে নাও চট করে'।

ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট বলে আশু ভিতরে চলে গেল। খুব তাড়াতাড়ি আশু ভেবে নিল-একটা বিরাট গণ্ডগোল হতে চলেছে। কারিনা কাপুর ওকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে আর দু দিন ওর সঙ্গে থাকবে, আবার ওর স্বামী আশুকে অনেক টাকা দেবে ফিরে এলে!! এইসব হয় নাকি?

আশু ঠিক করল, পালিয়ে যাবে এখনি। মধু যেই সরে গেছে, আশু ছুটে বাইরে পালিয়ে গেল। সোজা ছুট দিল পাশের বাড়ির দিকে। পাশের বাড়ি হচ্ছে একটা গুদোমঘর, প্রায় ২০০ মিটার দূরে।

সেখানের ক্যানাডিয়ান সিকিউরিটি গার্ড বন্দুক নিয়ে ওর জন্যে রেডি হয়ে ছিল।

'কী চাই কি, হারামি'? সিকিউরিটি গার্ড আশুকে প্রশ্ন করল। লোকটা খুব একটা ভদ্র বলে মনে হল না।

আশু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল 'চৌতালার বাড়িতে অনেক অবৈধ নাগরিক (illegal alien) এসে গেছে। প্লিজ পুলিশে খবর দিন স্যার'।

কী ভাগ্য গার্ডমশাই তক্ষুনি পুলিশ ডেকে দিলেন। তারপরে সব সিনেমার মতো হয়ে গেল-

প্রথমে দুটো, তারপরে দশ-বারোটা পুলিশের গাড়ি এসে গেল, বিশাল সার্চলাইট জ্বালিয়ে সমস্ত অবৈধ নাগরিকদের এবং বিলী, প্রকাশ চৌতালা আর মধুকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে গেল। বাড়িতে পড়ে রইল বুড়ো দাদু আর মধুর ছোটো মেয়েটা। আশু গুটি গুটি ওর মন্দিরে ফিরে গেল, পুলিশকে জানাল যে, ওই পালিয়ে গিয়ে ফোন করেছিল। পুলিশ বলল 'আপনার জবান বন্দি নিতে হবে, কাল সকালে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন'।

সব রাতেরই শেষ আছে। পরের দিন ঝকঝকে রোদ্দুর, আর তার মধ্যেই সাদা দাড়িওলা ঠাকুরদাদার সে কী গালাগালি। পাঞ্জাবি ভাষাটা আশু বোঝে না ভালো, কিন্তু বুঝল, আশুর বাবা-মা এবং গাধা, শুয়োর, ঘোড়া এইসবের নিকট সম্পর্ক নিয়েই ঠাকুরদাদা বকবক করছেন। শেষকালে বললেন, 'নিকাল যাও আভি, শুয়ার কা বাচ্ছা'।

এই মিষ্টি কথা শুনে আশু তাড়াতাড়ি একটা বড়ো ব্যাগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা ওর ব্যাংকে চলে গেল। যা টাকা জমেছিল সব ক্যাশ করে নেবার পরেই পুলিশকে ফোন করল, একজন অফিসার ওর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ব্যাংকের বাইরে রাস্তার ওপরে। গাড়ি থেকে নেমে ওকে ডেকে বললেন, 'হ্যালো আমি টরনটোর পুলিশ অফিসার, বাংলা বলতে পারি একটু একটু, আপনার কেস আমি দেখাশোনা করব।'

বুকের ওপর আইডিতে লেখা রয়েছে আবদুল, ইংরেজি একদম ক্যানাডিয়ানদের মতো বলে, বাংলা বোঝে ভালো কিন্তু বাংলা বলে ভাঙা ভাঙা, তাও বাংলাদেশের বাংলা, আবার আমেরিকার একসেন্ট দিয়ে, শুনতে খুব মজা লাগে।

'চলুন, ওই সামনের দোকানে গিয়ে একটু ব্রেকফাস্ট খাওয়া যাক।' খাওয়া হলে আবদুল বলল, 'আপনার প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি আমাদের লাগবে। আমি এক এক করে প্রশ্ন করব, আপনি পারলে ইংরেজিতে নয় বাংলাতে জবাব দেবেন। আমি বাংলা উত্তরগুলো অনুবাদ করে নেব, আপনার সই দিয়ে দেবেন শেষে।

জবানবন্দি নেওয়া শেষ হয়ে গেলে আবদুল সাহেব বললেন আপনাকে কোর্টে সাক্ষী দিতে হবে মনে হচ্ছে। একমাস এখন কোথাও যাবেন না।

এই শুনে আশু খুব কাঁচুমাঁচু হয়ে বলল, 'কিন্তু আমার পুরোহিতের চাকরি তো আজ সকালে চলে গেছে, একমাস নিজের পয়সায় এখানে থাকলে জমানো টাকা অনেক খরচা হয়ে যাবে।'

আবদুল সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন-'ঠিক

আছে, আমি অফিসে ফিরে গিয়ে দেখছি কী করা যায়, দু-ঘন্টা এখানে অপেক্ষা করুন।'

টরনটোর পুলিশের জবাব নেই। এক মাসের জন্য আশুকে হোটেলে রেখে দিল, খাবার জন্যে পয়সা দিল আবার। যে ক্যানাডিয়ান অফিসার আশুকে হোটেলে নিয়ে গেলেন, তার কাছ থেকেই আশু সব জানতে পারল 'এটা হচ্ছে human trafficking, এই লোকগুলোকে ইন্ডিয়া থেকে পাচার করে আনা হয়েছে। এদেশে অনেক ইন্ডিয়ানদের কারখানা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকান এসব আছে। এই লোকগুলোকে এইসব জায়গায় খুব কম টাকায় পরিচারকের বা মজুরের কাজ করানো হবে। মিস্টার চৌতালা হচ্ছে স্থানীয় distributor, কিন্তু পেছনে অনেক রাঘব বোয়াল আছে যারা এই বিরাট আন্তর্জাতিক ব্যাবসা চালায়, বহু কোটি ডলারের ব্যাপার। আমরা মিস্টার চৌতালাকে ভয় দেখিয়ে এই পালের গোদাদের ধরার চেষ্টা করব। আপনি এখানে একমাস থাকুন। এটা অফিস পাড়া, দিনের বেলা বেরোবেন, রাস্তায় প্রচুর লোক কোনো ভয় নেই, দুপুরের খাবার খাবেন আর রাতের খাবারটা দুপুর বেলাতেই কিনে আনবেন। সন্ধ্যাবেলা হোটেল থেকে বেরোবেন না মোটে। এই দলের গুন্ডারা কিন্তু আপনাকে খুঁজছে, পেলে একদম লাশ ফেলে দেবে। গুড লাক।'

হোটেলে বসে বসে আশু শুধু ভাবে কী হতে পারত। তিনদিন নায়গ্রা ফলসে পরির সঙ্গে সহবাস, আর ফিরে এসে প্রকাশের কাছ থেকে মুখ বন্ধ করার টাকা নিয়ে বড়োলোকের মতো আরামে দেশে ফেরা যেত। জীবনে একবার খারাপ কাজ করলে আর কী হয়েছে!! যাকগে কী আর হবে? বাল্মীকি মুনির সম্মান তো রক্ষা হয়েছে।

আশুর ভাগ্যটা ভালো, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব ঝামেলা মিটে গেল। বিলীকে একটু কড়কাতেই সে সব বলে দিল, ভয় পেয়ে প্রকাশবাবুও রাজসাক্ষী হয়ে গেলেন। কারিনা কাপুর, ইয়ে মানে মধুকে ছেড়ে দেওয়া হল। এবারে আন্তর্জাতিক স্তরে উঠে গেল কেসটা, রাঘব বোয়ালের খোঁজে বিভিন্ন দেশের পুলিশ, এফবিআই, ইনটারপোল সব একজোটে কাজে নেমে গেল।

আবদুল সাহেবকে অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য যাওয়ার আগে আশু একবার ফোন করল। ওনাকে খুবই খুশি মনে হল। আমেরিকান উচ্চারণে বাঙাল ভাষায় প্রশ্ন করলেন, 'খতদিন দ্যাশে যান নাই? সখলে ভাল্ল আসে তো?'

হাসি চেপে আশু বলল 'প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল। চললাম স্যার। অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

একেবারে আশু এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠে গেল। ওমা, খাবারের সঙ্গে একটা ছোটো বোতল ওয়াইন দিয়ে গেল ফ্রি। সেই খেয়ে কি ঘুম। স্বপ্নে এলেন বাল্মীকি মুনি, আমেরিকান কায়দায় ভি সাইন দিলেন, তারপরে একটু আশীর্বাদ করলেন, পেছন থেকে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান আর জাম্বুবান একটু ভাঙ্গরা নাচ করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করল, মধু একবার হাসিমুখে এসে ওদের দেখেই ভয়ে পালিয়ে গেল। খুশি মনে ঘুম থেকে উঠে আশুর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

'অনেক হয়েছে, এবার ভবিষ্যতের প্ল্যান করতে হবে। যা টাকা জমেছে আড়াই বছরে, তাতে ইছামতি নদীর ধারে একটা ছোটো দোকান খোলা যাবে, জমি আর দোকান থেকে মোটামুটি চলে যাবে। অবসর সময় সংস্কৃতচর্চা করা যাবে। হ্যাঁ বিয়ে একটা করতে হবে বইকী। *কুমারসম্ভব*, *গীতগোবিন্দ*, এইসব থেকে চমৎকার অংশগুলোর অনুবাদ করে বউকে পড়াতে হবে। আর *রামায়ণ* পড়তে হবে বাল্মীকির স্মরণে। জয় বাল্মীকি মুনির জয়।

(প্রবাসী ভারতীয়)

একান্ত আপন

আরতি ভট্টাচার্য্য

বিপত্নীক নকুলবাবু থাকেন সল্টলেকে ছেলের বাড়িতে। ছেলের অফিস বাড়ির কাছেই। বছর দশেক হল ছেলে এই বাড়ি বানিয়েছে। এর আগে কর্মরত অবস্থায় দীর্ঘদিন নকুলবাবু উত্তরপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে কাটিয়েছেন। স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা নিয়ে বেশ ভালোই ছিলেন। বেশকিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবও ছিল। এখানে নকুলবাবুর পুরোনো বন্ধুবান্ধব বা পুরোনো প্রতিবেশী কেউ নেই। তবে কোনো উৎসব উপলক্ষে যাতায়াত এখনও আছে। এখানে নতুন করে সেইরকম বন্ধুত্বও ঠিক কারও সঙ্গে গড়ে ওঠেনি।

স্ত্রীও মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। মাঝে মাঝে একাকীত্ব বোধ করেন ঠিকই। তবে জীবন চলেছে সরল গতিতেই। ছেলে-বউমা, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সদা সতর্ক। বাড়তি পাওনা নাতনি টুসকীর সঙ্গ।

মেয়ে রয়েছে কালিফোর্নিয়ায়। ছেলে, মেয়ে নিয়ে ওরা মহাব্যস্ততায় থাকে। নিজেদের চাকরি তো আছেই। প্রতি বছর আসা হয় না।

নকুলবাবু প্রতিদিন সকালে উঠে কিছু প্রাণায়ম করে চা খান। তখনই ছেলে দিব্য আর বউমা শ্রীলেখার সঙ্গে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় কিছু গল্প হয়। মাঝে মাঝে বাজারেও যান। শ্রীলেখা মেয়ের স্কুলেই চাকরি করে। ওরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেলে নকুলবাবু স্নান, আহ্নিক সেরে জলখাবার খেয়ে নেন। কাজের মেয়ে টেবিলে সব সাজিয়ে দেয়। তারপর বারান্দায় বসে পেপার পড়া, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ফোনে কথা বলা। নিজের ছোট্ট ফুলবাগানটার অল্পস্বল্প দেখাশুনা করেই সময় কেটে যায়। বউমা নাতনির ফিরতে ফিরতে দুটো তো বাজেই। সময়মতো খেয়ে নিতে বলা থাকলেও একা একা খেতে ভালো লাগে না। নাতনির উচ্ছ্বসিত গল্প শুনতে শুনতেই খাওয়াটা ভালো জমে।

দুপুরে বিশ্রামের পর রোজ বিকেলে পার্কে হাঁটতে যান। বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে দেশের কথা, রাজনীতি, শরীর, স্বাস্থ্য সব নিয়ে জমিয়ে আড্ডাও হয়। মাঝে মাঝে নাতনিও সঙ্গ নেয়।

একদিন এখানেই নিখিলবাবুর সঙ্গে নকুলবাবুর পরিচয়। নিখিলবাবু থাকে বালিগঞ্জে এক বৃদ্ধাশ্রমে। নাম তার 'একান্ত আপন'। সপ্তাহ খানেকের জন্য নাতির জন্মদিন উপলক্ষ্য করে ছেলের বাড়িতে আছেন। নকুলবাবু খুটিয়ে খুটিয়ে বৃদ্ধাশ্রমের কথা জানতে চান। আবার জানতে চান ছেলের বাড়ি থাকতে কেন তাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হল।

নিখিলবাবু বলেন- দেখুন, ছেলের বাড়িতে এমনিতে কোনো অসুবিধাই নেই। ছেলে, বউমা দুজনেই ভালো চাকরি করে। আমার সুখ-সুবিধার সকল ব্যবস্থাই ওরা করে রেখেছে। তবে আমার জন্য ওদেরও স্বাধীনভাবে চলার কিছু কিছু ব্যাঘাত হয় এও তো বুঝি। স্ত্রীই যখন নেই তখন শুধু শুধু ওদের মন রক্ষা করে এখানে পড়ে থাকব কেন? আমরা ওখানে বেশ আছি। বেড়ানো-খেলানো, গল্প-আড্ডা, শরীরচর্চা সবরকম সুব্যবস্থাই আছে ওখানে। ইচ্ছে করলে আপনিও চলে আসতে পারেন। দেখবেন ভালোই লাগবে।

ফিরে এসে নকুলবাবু নিজের মনে অনেক চিন্তা করেন। নিখিলবাবুর সব কথার মধ্যেই বেশ যুক্তি আছে মনে হয়। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর তারও মাঝে মাঝে বেশ নিঃসঙ্গ লাগে।

পরদিন নিখিলবাবু প্রশ্ন করেন- কী ঠিক করলেন নকুলবাবু? আরে চলে আসুন, চলে আসুন। বেশ মজা করেই শেষ বয়সটা কাটাতে পারবেন। এই আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর রাখুন। আগামীকাল আমি ফিরে যাচ্ছি। মন স্থির করলে জানাবেন। বন্ধু হিসেবে যতটা পারি পাশে থাকব।

নকুলবাবু বলেন, - ছেলে বউমার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিই। ওদেরও তো একটা মতামত থাকবে। এমনিতে সব শুনে আমার তো ভালোই লাগছে। অনেক রাত পর্যন্ত নকুলবাবু চিন্তা করতে লাগলেন- কোন্ শৈশবে বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন। শুনেছেন বাবা খুবই সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। বাবার চেহারাও তার মনে নেই। সেই থেকে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত মামা বাড়িতে মায়ের সঙ্গে বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে থাকতে হয়েছে। যদিও মামাবাড়ির সকলেই তাদের খুব ভালোবাসত। মাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে

সকলের মন জয় করতে চেষ্টা করতেন।

নিজে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েই আলাদা বাসা করে মাকে সেই অমানুষিক পরিশ্রম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন। আরও একটু ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করেছেন মালতী দেবীকে। মা, পুত্র, কন্যা সবার প্রতিই সমান কর্তব্য পালনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে মালতী দেবীর অবদানও কম ছিল না। এখন দিব্য সুপ্রতিষ্ঠিত, কন্যাও সুপাত্রস্থ। বর্তমানে মালতী দেবীই যখন নেই তখন সংসারে তার আর কীসের প্রয়োজন। সমগোত্রীয়দের মধ্যে থাকলে তারও হয়তো ভালো লাগবে।

পরদিন চা খেতে খেতে ছেলে-বউমার কাছে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন নকুলবাবু। ওরাও একেবারে অপ্রস্তুত। দিব্য বলে,- আমাদের কথা না-হয় না-ভাবলে, কিন্তু তুমি পারবে আমাদের ছেড়ে থাকতে? আর টুসকী? ওই বা তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে?

নকুলবাবু বলেন,- না না তা কেন? টুসকী তো এখন বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া তোর শ্বশুরবাড়ি তো কাছেই, টুসকী দাদু-দিদার কাছে ভালোই থাকবে। আমিও তো তোদের একটা ঘর জুড়ে আছি। বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে একটু আনন্দ ফুর্তি করবি, তাও তো আমার জন্য পারিস না।

শ্রীলেখা বলে,- বাবা আমরা নিশ্চয়ই অজান্তে আপনাকে কোনো ব্যথা দিয়েছি। তা না-হলে এমন কথা কেন ভাবলেন? নকুলবাবু বলেন- ছি, ছি বউমা, অমন কথা বোলো না। আসলে তোমার শাশুড়ি মা নেই বলেই হয়তো আমার এসব মনে হয়। দেখিই-না যদি আমার ওখানে ভালো লাগে। তা ছাড়া আমি তো মাঝে মাঝে আসবই।

দিব্য বলে-বাবা, তোমার যখন ভালো মনে হয়েছে, তখন অবশ্যই যাবে। তবে সামনে পুজো, এখন ওসব কথা থাক। আগামী সপ্তাহে আমরা সবাই পুরি যাচ্ছি। তৈরি থাকবে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। অনেক দিন কোথাও যাওয়া হয়নি।

পুরিতে এসে সমুদ্রের ধারে একটা ভালো হোটেলে দিব্য সবাইকে নিয়ে উঠল। প্রতিদিন ওরা সমুদ্রে স্নান করে। নকুলবাবু অবশ্য জলে নামেন না। নাতনিকে নিয়ে বালিতে বসে নানা খেলা করেন। এর মধ্যে একদিন মন্দিরে পুজো দেওয়া হল। জগন্নাথদর্শন হল। নকুলবাবু বেশ খুশি। কলকাতায় ফিরে আসার আগের দিন বিকেলে কিছু কেনাকাটা করা হল। সমুদ্রের ধারে বসে চা খেয়ে দিব্যরা হোটেলে চলে গেল। নকুলবাবু বলেন- তোরা যা খোকা, আমি কিছুক্ষণ থাকি। এখনও তো বেলা রয়েছে, লোকজনও অনেক আছে।

সেই মত দিব্য বউ-মেয়ে নিয়ে হোটেলে ফিরে গেল। নকুলবাবু বালির উপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেলেন। এক জায়গায় দেখলেন একটি ছেলে বালি দিয়ে কী সুন্দর শিবের মুখ বানিয়েছে। সবাই বাহবা দিচ্ছে কিন্তু পয়সা তেমন কেউ দিচ্ছে না। নকুলবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিলেন। ছেলেটি খুব খুশি হল। তাই দেখে একটা বাচ্চা ছেলে হাতে ছোটো ছোটো ক-টা প্রদীপের সলতের প্যাকেট, দাদু নাওনা দুটো। তাকেও পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বলেন- এটা নে, আমায় সলতে দিতে হবে না। ছেলেটি বলে- না দাদু, মা বলেন ভিক্ষা করতে নেই। অগত্যা তিনি পাঁচটি প্যাকেট নিলেন। আর জিজ্ঞেস করলেন- তুই স্কুলে পড়িস না?

ছেলেটি খুশি মনে বলে হ্যাঁ তো। স্কুল তো সকালে, আর বিকেলে আমি মার হাতে তৈরি সলতে বিক্রি করে যে-পয়সা পাই তাই দিয়েই খাতা, পেনসিল কিনি। দাদু আবার জিজ্ঞেস করেন- তোর বাবা কী করে? সে বলে- দাদু, আমার বাবা তো বড়ো নুলিয়া। এখন বাবা ওইতো বালিতে বসার জন্য চেয়ার সাজাচ্ছে। জানো তো দাদু, আমার বাবার অনেক দায়িত্ব। যারা ভালো সাঁতার জানে না, বাবা তাদের সমুদ্রে স্নান করতে সাহায্য করে। আবার সমুদ্রে ডুবতে চলেছে এমন কত লোকের প্রাণ বাঁচায় বাবা। ছেলেটির বাবার কাজের প্রতি গর্ববোধ দেখে নকুলবাবুরও খুব ভালো লাগল।

এরপর নকুলবাবু একটা চেয়ার ভাড়া করে বালির ওপর বসে সমুদ্রের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। দেখতে দেখতে সূর্যের লাল রশ্মিটুকু কখন যেন তলিয়ে গেল অতলে। জ্যোৎস্নার আলোতে সমুদ্রের ঢেউগুলো যেন অনেক বড়ো দেখাতে লাগল। আবার সেই ঢেউগুলো ক্রমশ এগিয়ে এসে তার অন্তরে যেন প্রবেশ করতে লাগল। ক্রমে সমুদ্রের মতো অন্তরেও

শুরু হয়ে গেল প্রলয় তাণ্ডব। ঢেউয়ের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কালের অনেক চেনা মুখ একে একে উঠে আসতে লাগল। আবার মিলিয়ে গেল। মা, পিসি, মামা বাড়ির ছেলে বেলার বন্ধুবান্ধব, দূর সম্পর্কের মাসি, মেসো যার কাছে মায়ের চিঠি নিয়ে প্রথম কাজের সন্ধানে এসেছিলেন, এমনকী তার প্রথম কর্মদাতা সেই ছাপাখানার মালিক, যিনি অপত্যস্নেহে তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সব, স-ব দেখা দিল। কিন্তু তার মধ্যে তিনি মালতী দেবীকে দেখতে পেলেন না। তবে কি জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোতে মালতী দেবী মুছে গেল?

এবার মুখ তুলে তিনি অসংখ্য তারাখচিত আকাশের দিকে তাকালেন। আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলেন স্ত্রীকে। হঠাৎ মনে হল তার চারপাশের জ্যোৎস্না যেন খিল খিল করে হেসে বলছে- কীগো, আমায় পাচ্ছ না? আমি সর্বক্ষণই তোমার পাশে রয়েছি ছায়ার মতো।

তুমি তো জান, ফুল ঝরে গেলেও তার শোভা শেষ হয়ে যায় না। সে টিকে থাকে তারই সৃষ্ট বীজের সম্ভাবনার মধ্যে। খোকাই তো সে সত্তা। এখন আর তুমি নও, খোকাই তোমার অভিভাবক। জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলায় তুমি কখনও হারোনি। বারবার জিতেই এসেছ। তবে এখন কেন আবোলতাবোল চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেল, শ্বশুরমশায় এখনও ফিরলেন না দেখে শ্রীলেখা দিব্যকে পাঠাল। সী বিচে এসে দিব্য দেখে বাবা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কেমন আনমনা হয়ে বসে আছেন। পুত্রের উপস্থিতি তিনি খেয়ালও করলেন না।

দিব্য বাবার কাঁধে হাত রেখে বলে, বাবা ঘরে চলো, রাত হয়ে গেল যে। নকুলবাবু চমকে উঠে ছেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কেমন তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন- খোকা, আমি তোদের ছেড়ে থাকতে পারব না। কখনও তো থাকিনি। আমি তোদেরকে জড়িয়ে থেকেই বাঁচতে চাই।

দিব্য বলে-আমি জানতাম বাবা, তুমি কখনও আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে না। তুমি যে শুধু আমাদের, শুধু আমাদের। তুমি কোথাও যাবে না বাবা, কোথাও না। এই বলে বাবাকে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরল দিব্য।

(সোনারপুর, কলকাতা)

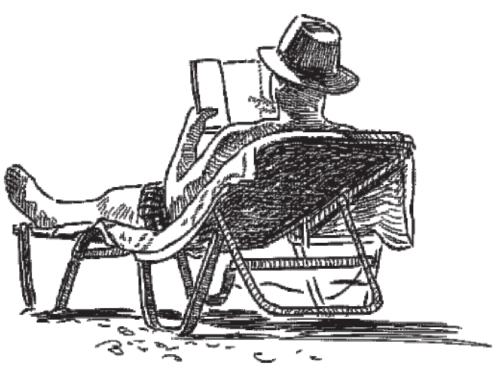

ইনফর্মার

অপূর্ব কর্মকার

কলেজ স্ট্রিট মোড়টা আসতেই ঠাসাঠাসি ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া মিনিবাসটা থেকে ধস্তাধস্তি করে ফুটপাথের রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম। ঘর্মাক্ত কলেবর। উসকোখুশকো মাথার চুল। তলপেটের নীচে নেমে আসা জামাটা কোনোরকমে প্যান্টের ভেতরে আবার গুঁজে নিয়ে রাস্তাটার উলটোদিকে বইপাড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। নামকরা লেখকের কিছু পুরোনো বই যদি সস্তায় পেয়ে যাই কিনব বলে। ফুটপাথে লাগোয়া সারিবদ্ধ ছোটো-বড়ো বইয়ের স্টল, নতুন পুরোনো আবার শুধুমাত্র নতুন বা শুধুই পুরোনো বই কেনার আদর্শ জায়গা। 'দাদা, আসুন, কী বই খুঁজছেন'? রবীন্দ্রনাথ- শরৎচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলিও পাবেন এখানে। 'স্যার, আমাদের কাছে কলেজ-ইউনিভার্সিটির বইও পাবেন। রায় মার্টিনের ইংলিশ গ্রামার পাবেন, কুড়ি পার্সেন্ট কমিশনে, হাফ দামেও কিছু বই পাবেন, আপাদমস্তক পাতা চেক করে দেখে নেবেন। তবুও অগুনতি বিক্রেতাদের নানা কণ্ঠস্বরের নানা অনুরোধ-উপরোধগুলো অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। আমার গন্তব্যস্থল সেই সামন্ত বুক স্টল, স্টল নম্বর ২২৪। নম্বরটা এখনও মনে আছে। আগে প্রায়ই আসতাম এখানে। বই পড়া দীর্ঘদিনের অভ্যাস। মাঝে মাঝে সময় পেলে একটু-আধটু লেখার চেষ্টা করি। সম্প্রতি দু-একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছে। আরও ভালো লেখার উৎসাহ-বাসনাও রয়েছে। হঠাৎ উলটোদিকের মহাত্মা গান্ধি রোড থেকে আমার মতোই এক বয়স্ক লোককে হেঁটে আসতে দেখলাম ধীর লয়ে। রোগাটে গড়ন, মাথায় এক রাশ পাকা চুল, চোখে ভারী কাচের চশমা। পায়জামা পাঞ্জাবি পরা। কাঁধে ঝোলা কাপড়ের ব্যাগ। কোথায় যেন দেখেছি, কোথায় যেন দেখেছি, ভেবে উঠতে উঠতেই আমাকে উনি অতিক্রম করে চলে গেলেন। আর তখনই ধূর্জটিকে মনে পড়ে গেল। ঠিক যেন তারই মুখচ্ছবি, চেহারাটাও বিশেষ পালটায়নি। আমাদের বাড়ির উলটোদিকেই ওর চশমার দোকান ছিল। 'মডার্ন অপটিকো'। শেষ বয়েসে ঘন ঘন চোখের পাওয়ার পালটে যাওয়া বাবাকে ওর কাছে নিয়ে যেতে হত। ও অপথ্যালমোলজিতে প্রাইভেট কোর্স করেছিল। পসার ভালো ছিল। চোখে সিট লাইটের আলো ফেলে ভালো করে দেখত আগে এট্রোপিন দিয়ে। ABCD...1234 বিভিন্ন হরফের অক্ষর পড়তে দিয়ে উপযোগী পাওয়ার প্রেস্ক্রিপশন করতো। বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট থেকে এরপর পাওয়ার ফ্রেমে বাঁধিয়ে আনত। আই টেস্টের ফিস আর সর্বসাকুল্যে যা দাম নেওয়ার কথা বাজারদর অনুযায়ী অনেকটাই কম ছিল ওর। মাঝে মাঝে আমাদের কাজের ফাঁকে দুপুর বেলায় বা রাতে ওর দোকান বন্ধ করার আগে নানা বিষয় নিয়ে আড্ডা হত। ক্রমে আমাদের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমরা তুই-তোকারির পর্যায়ে নেমে এসেছিলাম। দোকানটা কী জানি কেন তারপর অনেক দিন বন্ধ থাকার পর হঠাৎ বিক্রি করে কোথায় চলে গেল। আমি তখন টাটানগরে জেনারেল অর্ডারের ব্যাবসাটা বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে যেতাম। সেই সময়েই দোকানে আলোচনার ফাঁকে সে একদিন একটা কথা আমাকে জানিয়েছিল গোপন রাখার ব্যাপারে। একদম স্পিকটি নট হয়ে। সে নাকি বেহালা এলাকার সরকারি ইনফর্মার। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অধীনে। গোপন খবর চালান করত থানাতে সঙ্গোপনে। কথাটা শুনে হাঁ করে থাকায় আরও বলেছিল, 'অবাক হওয়ার কিস্যু নেই, আমাদের মতো সাদামাটা লোকেরাই স্থানীয় থানায় গোপন খবর চালান করে। কেউ সন্দেহও করে উঠতে পারে না আমাকে অত্যধিক গোপনীয়তার জন্য। এই যেমন বেহালা এলকায় চুরি-চামারি, কেপমারি, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, গুন্ডাগর্দি, নারী চালান, মাদক সাপ্লাই, সন্দেহভাজন ব্যক্তির উপস্থিতি, ধর্ষণ, অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদি নানা কেসের। বেহালা থানায় আগেভাগে জানিয়ে দেওয়াটাই ইনফর্মারের দস্তুর। অনেক সময় থানা থেকেও এসব কেসের সরজমিনে তথ্য জোগাড় করে দেওয়ার হুকুম আসে কাকপক্ষীর নজর এড়িয়ে পুরোটাই। কেউ জানে না আমার এই আর-এক অন্য কাজের কথা। চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। তবে এর জন্য থানা থেকে খবরভিত্তিক অনিয়িমিত পারিশ্রমিক পেলেও সেটা খুব কম ছিল। মাসোহারা নয়। তবে তাতে তার চলে যেত 'মডার্ন অপটিকো' ছিল বলে। আসলে এই কাজ করতে তার নাকি খুব ভালো লাগত। কত অপরাধ কর্ম মানুষ যে করতে পারে সে জানতে পারত। কেসগুলোর পরিণতি জানতে পেরে আরও কাজ

করার উৎসাহ তার জন্মে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে উলটো বিপত্তিরও সম্মুখীন হতে হত। ভালো করতে গিয়ে মন্দ হত। খবর চালান করে সে ঠিক করত না ভুল করত সে বিষয়ে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

যা হওয়ার হবে। পিছন থেকে 'ও ধূর্জটিবাবু, ও ধূর্জটিবাবু' চিৎকার করে হাত নাড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্থ গলায় চেঁচাতেই ভদ্রলোক পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে আগুয়ান হলেন। অনুমান সত্যি হল উনিই সেই ধূর্জটি বঙ্গবাস। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু হয়ে বললেন, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না। কোথায় দেখেছি বলুন তো।' আশ্বস্ত হয়ে বললাম, 'আমি রাধাকান্ত বরাট, বেহালায় থাকি, যতদূর জানি আপনি বাঁশদ্রোণী এলাকায় থাকতেন। বেহালায় আপনার মডার্ন অপটিকো নামে চশমার দোকান ছিল বহু বছর আগে তাই না। বাবাকে নিয়ে যেতাম দোকানে ওনার পাওয়ারের জন্য।' কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ওই জনবহুল রাস্তায় উনি আমাকে দু হাতে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'কী আশ্চর্য। শ্লা... চিনতেই পারিনি, তা প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা হবে?' হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'কেমন আছিস? আর মেসোমশাই! প্রায় দশ বছর আগে মারা গেছেন শুনে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'বড়ো ভালো মানুষ ছিলেন। মাসিমা তো তার আগেই মারা গেছেন না।' আমি ঘাড় ইতিবাচক নাড়াতেই বলে উঠলেন, 'এবার কোনো তুমি-আপনি নয়, অ্যাই তোর হাতে সময় আছে? কতদিন পরে হঠাৎ দেখা, তাও আবার এইভাবে, চল, কফি হাউসে বসে সময়ের জট ছাড়াই, অনেকদিন ডেভিল আর কফি খাইনি, গলাটাও শুকিয়ে গেছে। সত্যি সত্যি, অনেকদিন পরে আমাদের দেখা হল, তাই না?'

এড়াতে পারলাম না। আমারও ওর সঙ্গে সময় কাটানোর প্রবল ইচ্ছে ছিল। সেই কবেকারের ধূর্জটি। বই কেনার অনেকটা সময়ও হাতে আছে এখন। যদিও আমার বইপাড়ায় আসার উদ্দেশ্য ওকে বলিনি, ও জিজ্ঞাসাও করেনি।

সেঁকা টোস্ট, ডেভিল আর কফি নিয়ে হাউসের একটু ভিতরে দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসলাম।

কথাবার্তা চলতে লাগল।

ধূর্জটি - কীরে কেমন আছিস। কী করছিস? ব্যাবসা না চাকরি থেকে রিটেয়ার করেছিস। সংসার ধর্ম?

আমি প্রত্যুত্তরে বললাম- নারে, সংসার ধর্ম হয়ে উঠেনি। ছোটোখাটো এক ব্যাবসা করতাম, প্রথমে জেনারেল অর্ডার সাপ্লাই-এর আর পরে পটেটো চিপস, স্ন্যাক্স, ভুজিয়া, বিস্কুটের পাড়ায় পাড়ায় মার্কেটিং। ঝাড় খেয়ে গেলাম। আর সাহসে কুলোল না। বাড়িতে তিন ঘর ভাড়াটিয়া আছে। চলে যাচ্ছে, চালিয়ে যাচ্ছি আর কি। ইউরিক অ্যাসিড আর ট্রাইগ্লিসারিডের ব্যামো ধরেছে সবে। বল, তুই কী করছিস এখন? টোস্টের একটা ফালি মুখের মধ্যে আঙুলে ঠেসে পুরে দিয়ে ধূর্জটি বলল, শরীর ঠিক আছে, তবে দাঁতের সমস্যা শুরু হয়েছে। সংসারটাও ভেঙে গেল, মানাতে পারলাম না, শেষে ডিভোর্সও হল। ছেলেপুলে হয়নি। চশমার দোকানটাও সাংসারিক অশান্তিতে রাখতে পারলাম না। আশপাশ দেখে নিয়ে চুপিসারে এবার সে বলল, তোকে কী আমার অন্য ধান্দার কথা বলেছি? আমি হাঁ বলাতে সে বলল, সে আগের ধান্দাই এখনও করে যাচ্ছে, ছাড়তে পারেনি। তার কাজের এলাকা এখন অনেক বড়ো হয়ে জেলা-গুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে। নানা সামাজিক অশ্লীলতা, আর্থিক কেলেঙ্কারি, সাইবার অপরাধ বর্তমান প্রেক্ষিতে দেখা দিয়েছে। ফলে এসব অপরাধের ছোটো ছোটো কেসও তাকে হাতে নিতে হচ্ছে। রোজগার মন্দ হয় না। তবে কী জানিস, আমার এই ধান্দা বর্তমানে আরও ভীষণ অনিশ্চয়তাময়, ঝুঁকিপূর্ণ এবং প্রবল বিপদসংকুল। যদিও কাজগুলোর মানবিক দিকটা দেখে চলতে হয়। আর পুলিশ বিভাগও আগের মতো নয়, সন্তর্পণে কাজ সেরে ফেলতে হয় উপর মহলকে না-চটিয়ে। এই দ্যাখ না, এখান থেকে একটা ঘরোয়া কেসে এখন তপসিয়া লেদার কমপ্লেক্সে যাব। বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কেস। মাঝে মাঝে কয়েক বছর পর পর পলাতক বাড়িতে ফিরে এলেও আবার পালিয়ে যান কয়েক দিন থাকার পর। এরকম আগে তিনবার হয়েছে। আমি বললাম- 'তা এর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক। পুলিশ বা আদালত তো সমাধান করে দিতে পারে ঘটনাগুলোর।' ঈষৎ হেসে সে বলল, 'নারে, সব সময় তা হয় না, তাহলে তো ইনফর্মারের প্রয়োজনই হত না, যেমন এ কেসটা। পলাতকের পরিবারই আমাকে ডেকে ওনাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওনাদের এই পারিবারিক ঘটনাটা ব্যক্ত করেছেন এবং সমাধান করার জন্য অনুরোধ করেছেন। অথচ ইনফর্মারের কাজ সেটা নয়।

ওনারা পুলিশের সাহায্য সরাসরি নিতে চান না যেহেতু জনসমক্ষে সকলে জানতে পারবে বলে। আমার সন্ধান কী করে ওনারা পেলেন বলেননি পরিষ্কার করে, গোপনও করতে পারেন ওনারা, আবার হয়তো পুলিশ বিভাগই কেসটির ব্যাপারে কিছু ভেবে আমার নাম ওনাদের জানাতে পারে। পরিবারের মধ্যেও কেউ হয়তো বেনামে পুলিশে জানাতেও পারেন। পলাতকের পরিবারে আছেন ওনার আশি বছর বয়স্কা শয্যাশায়িনী মা নীভা দেবী আর তাঁর তিন ছেলে যথাক্রমে রাধারমণ, বংশীবদন ও পতিতপাবন মজুমদার ও এক মেয়ে অঞ্জনা। ছোটো ছেলে পতিতপাবনই পলাতক ও নিরুদ্দিষ্ট গত চার বছর ধরে। ছেলেদের কারুরই বিয়ে হয়নি। বোন বিবাহিত, স্বামী শীর্ষেন্দু ঘরজামাই। ওদের বাড়ি আন্দুলের হাঁসখালি পোলের কাছে। সবাই শিক্ষিত। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল, পতিতপাবন ছাড়া তিন ছেলেদের কেউই পতিতপাবনকে বাড়িতে ঢুকতে দিতে চান না, নীভা দেবী ছাড়া। আমি ছোটো ছেলের পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে ওনারা কেউই জানাননি। বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল লেগে আছি কেসটাতে। হঠাৎ গতকালই তপসিয়াতে লেদার কমপ্লেক্সের সামনে এক জটলায় উঁকি মারলে পলাতককে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখি। সেই সময় সৌভাগ্যবশত পতিতপাবনকে প্রথম চাক্ষুষ দেখি এবং উনিই যে সেই পলাতক ব্যক্তি তাতে তাকে চিনতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি। পকেট থেকে পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটো এবার ধূর্জটি আমাকে দেখিয়ে বলল, 'ইনিই পতিতপাবনবাবু, কপালের ডানদিকে কাটা দাগ, ডানহাতে ছ-টি আঙুল ও মৃগী রোগী। ওনার পরিবার আমাকে আগেই জানিয়েছেন তার শরীরের এই সব আইডেন্টিফিকেশন চিহ্নর ব্যাপারে। এরপর রাস্তার লোকেরা চোখে-মুখে জল দিলে উনি সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে কমপ্লেক্সের পিছনে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতরে নিজে হেঁটে চলে যান। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে শুধু এটুকুই জানতে পারলাম যে, উনি ওখানেই বেশ কিছুদিন আস্তানা গেড়েছেন। আমার কেমন যেন ঘটনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। কী হতে পারে? কোথায় রহস্যের যবনিকা পড়বে অবশেষে! বই কেনা মাথায় উঠল। ধূর্জটিকে বলেই ফেললাম, 'তুই আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যাবি তপসিয়া?' কি জানি কেন সে রাজি হল। বলল, 'তোর কাজ আছে না এখন?' আমার হাতে সময় আছে বলাতে কেবিন থেকে কিছু আহার্য কিনে প্যাকেটে পুরে সে একটা ট্যাক্সিতে আমাকে তুলে নিয়ে সোজা লেদার কমপ্লেক্সের সামনে একটা বিশাল বট গাছের সামনে এসে দাঁড়াল। পতিতপাবনবাবু বসে আছে গাছে ঠেস দিয়ে হাতে একটা বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে। সুঠাম দেহ, কাঁধ পর্যন্ত নোংরা জটপাকানো চুল, মুখময় হালকা দাড়ি, চোখ কোটরাগত, ময়লা লুঙ্গি আর ফতুয়া পরিহিত। কিছুক্ষণ ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে উনি বেশ বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনারা, কী চান আমার কাছে, আমাকে মা-দাদাদের কাছে নিয়ে যেতে চান?' খাবারের প্যাকেটটা ওর হাতে দিতেই গোগ্রাসে খেতে খেতে সে অভিমানে বলল, 'আমি যেতে পারব না, আর কীই বা হবে গিয়ে সেখানে।' যেদিন থেকে আমার কলেজ ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটগুলো দাদারা দাদাগিরি করে নিজেদের কাছে রেখে দিল, আমার সর্বস্বান্ত হতে আর বাকি কিছু রইল না। কি আর চাকরি পাব আমি, চাকরির বয়সও যে কবে পার হয়ে গেছে, আসল সময়েই সার্টিফিকেটের অভাবে দরখাস্ত ভরতে পারিনি। মা অনেক করে দাদাদের মিনতি করেছিল ওগুলো ফেরত দিতে। দাদারা একটাও পয়সা দিয়েও কোনোদিনও সাহায্য করেনি। মা অবশ্য বলেছিল ওনার পেনশন থেকে আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকা দেবেন। কিন্তু... দাদারা না করে দেন। আমাকে পরিবারের একজন মানতে চান না। মাকে সময় পেলেই তারা অকথ্য গালাগালি করতেন আমার ব্যাপারে। বোন এবং জামাইবাবুরও অন্যথা হয় না।

ধূর্জটি ওর হাতে খাবারের প্যাকেটটা তুলে দিলে সে গোগ্রাসে খেতে লাগল। খাওয়ার ফাঁকে অনুরোধ করল আমি কথা দিচ্ছি পতিতপাবনবাবু, বাড়ি চলুন, আপনার মা ও দাদারা আমাকে কথা দিয়েছেন এর যথাবিহিত সমাধান করবেন। আপনি আপনার সমস্ত সার্টিফিকেট ফেরত পেয়ে যাবেন, ওনারা রাজি হয়েছেন দিয়ে দিতে। কেন জানি না, পতিতপাবনবাবু ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাতর স্বরে অবিশ্বাসী চোখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি বলছেন, মা বলেছেন? কতদিন ওনাকে দেখিনি, আমার মা বলেছেন যখন নিশ্চয়ই যাব।' এও ঠিক হল আগামীকালই পতিতবাবুর বাড়ি আন্দুলে যাওয়া হবে।

পরের দিনের কথা। পতিতপাবনবাবুর বাড়ি। ধূর্জটি ওনাদের কাছে আমার পরিচয় দিল ওর সহকর্মী বলে। উপস্থিত পরিবারের সকলেই। হুইল চেয়ারে বসা মা নীভা দেবীকে পতিতপাবনবাবু প্রণাম করে বললেন, 'মা কেমন আছ তুমি, জানি তুমি সুখে নেই, আমি সত্যিই পতিত হয়েছি, পাবন আর পাব না। মা চোখের জল চেপে অন্য দুই ছেলেকে বললেন, তোরা আর ঝামেলা করিস না। শেষ বয়সে আর অশান্তি সহ্য হয় না। তোদের কথা মতোই আমার আর তোর বাবার যা-কিছু আছে তোদের সবাইকে বেশিরভাগটাই সমান ভাগে ভাগ করে দেব। উকিলকে ডেকে নিয়ে আয় যত তাড়াতাড়ি পারিস। বাড়িটাকেও তো ছাড়তে হবে। রেন্ট কন্ট্রোলে আর কত দিন অন্যায়ভাবে টাকা জমা করবি। আমি বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাব শেষ জীবনটায়। তোরা নিশ্চয়ই তোদের মতো আলাদা আলাদা থাকতে পারবি। মেয়ে-জামাইদেরও অখুশি করব না। পতিতকে ওর সার্টিফিকেট যা যা আছে দিয়ে দে। এখনও যদি ও চাকরি জুটিয়ে নিতে পারে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তোদের তো আপত্তি থাকতে পারে না।' রাধারমণ ইতর স্বরে বলে উঠলেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তা হতে দেব না।' বংশীবদন পোঁ ধরলেন, 'পতিত পড়াশোনায় অনেক ভালো আমাদের দুজনের থেকে ও ভালো চাকরি পাবে, ভালো থাকবে চাই না। আমরা এটাও চাই না তোমার কাছ থেকে ও কোনো কিছু পাক।' রাধারমণ জুড়লেন, 'আমাদের দুজনের মধ্যেই সমস্ত ভাগ করে দাও।' অঞ্জনা মুখে কাপড় চেপে কাঁদছিল কিনা কে জানে! অন্য ঘরে ওরা উঠে চলে গেলে ধূর্জটি আমার মুখের দিকে চাইল। আমার মনের কথা পড়তে চাইছিল সম্ভবত এই কথা ভেবে যে ও যেটা ভাবছে আমিও সেটাই ভাবছি কিনা। সংসারের পঙ্কিল আবর্ত যা বয়ে চলেছে আবহমান অনাদি কাল থেকে সমাজের বুকে। টাকাপয়সাই জীবনের পরম ধন, আর কিছু সব পরে। নীভা দেবী এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তা বলে পতিত কি রাস্তার নর্দমার ভাত তুলে খাবে। ও কি পাগল? তোদের ভাইটার কি এটাই পরিচিতি আর পরিণতি হবে?' ঘরে যেন বজ্রপাত হল। পতিতবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মা তুমি কি যা তা বলছ? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?' অঞ্জনা দেবী আর শীর্ষেন্দুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নিভা দেবী বলে চলেন, ধূর্জটি আমার আর বিশ্বাস হয় না যে ওদের আমি পেটে ধরেছি আর আরও বললেন পতিত তো ইনফরমারের কাজ করে পুলিশ দপ্তরে। 'বাবারা, আমি কিন্তু এতদিন কিছুই বলতে চাইনি, কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম দুই ছেলেদের মতিগতি দেখে। এত স্বার্থপর, নির্লজ্জ আর বিবেকহীন আমাদের ছেলেরা? আজ ওদের বাবা বেঁচে থাকলে ... কীরে, পতিত বল্ না আমি কি কিছু মিথ্যা বলেছি। পুলিশ দফতর থেকে আমাকে জানানো হয়েছে পতিতের এই কাজের ব্যাপারে তবে গোপনে। না-হয় ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো না। পাশে বসা ধূর্জটির হাত আমার পাঁজর মৃদু স্পর্শ করে কিছু বোঝাতে চাইল। ঘর নিস্তব্ধ, কী এক চাপ চাপ উত্তেজনায়। চুপ করে রইলাম পতিতবাবুর কথা শুনতে, 'মা ঠিকই বলেছেন, পাগলের ছদ্মবেশে গত তিন বছর রয়েছি। এক অবাঙালি ঠগবাজ প্রতারককে হাতেনাতে ধরতে। হাওড়ার শিবপুরে ধর্মতলা লেনের এক পরিওয়ালা বাড়িতে আত্মগোপন করে আছে সে। অন্য রাজ্য থেকে এসে চুপিসারে নানা স্মাগলিংয়ের কাজ করছে। ওই বাড়ির আর সকলকে দেখা গেলেও ওর দেখা পেতাম না। অনেক চেষ্টা করেছি একবার যদি শনাক্ত করতে পারি কোনোভাবে। জেদ চেপে গেছিল মাথায়। অনেকদিন ওই বাড়ির সামনের রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থেকেছি সারা রাত জেগে যেমনটা থাকতাম পড়াশোনার দিনগুলোতে। এমনকি দিনের বেলায় সামনের নর্দমার নোংরা ভাতও খেতাম। নোংরা ঘাটতাম দিনের-পর-দিন। একবার অন্তত ওর দেখা পেতে। পাগলের অভিনয় করে গেছি অহরহ নির্ভুলভাবে ওকে ধরব বলে।'

রাধারমণ ও বংশীবদনবাবু চেয়ার ছেড়ে ভিতর থেকে একটা ফাইল এনে পতিতবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'দেখে নে তোর সব সার্টিফিকেট অরিজিনাল পেলি কিনা আর মা, আমাদের ক্ষমা করো।' অঞ্জনা এবার সত্যিই কাঁদছিল। পতিতবাবু ফাইলটা নিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, 'মা, আমার কোনো কিছু ভাগের দরকার নেই, এই সার্টিফিকেটগুলো যদি কাজে লাগাতে পারি এই কাজের পদোন্নতিতে, সেটাই বড়ো ব্যাপার। মা, আমি কিন্তু আবার আসব তোমার সঙ্গে দেখা করতে। নিজের পায়ে আমি দাঁড়াবই।'

আমরা তিনজন এরপর ওইদিন বাড়ির বাইরে এসে অনেকটা পথ কথা বলতে বলতে হেঁটেছিলাম একসঙ্গে।

ধূর্জটি পতিতবাবুকে প্রশ্ন করেছিল, কোথায় যাবেন এখন তাহলে? উত্তর দিলেন, 'তপসিয়ার সেই বট গাছের নীচে, আর পিছনের ঘরেই আমি থাকব। আমি পতিতবাবুর দিকে শুধু চেয়েছিলাম, কিছু বলতে পারিনি। ইনফর্মারের কাজ করা সামান্য কথা নয়, কখনো-কখনো মৃত্যুও হানা দিতে পারে তাদের। উপার্জন নয়, শুধুই ইনফর্মারের কাজকে একান্ত ভালোবেসে, উদ্যত সাপের বিষাক্ত ফনার সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে সাপুড়ের মতো।

আরও কিছুদিন পরের কথা। খবরের কাগজে ছোটো আকারে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল- 'কুখ্যাত প্রতারক মুৎসি জহুরি অবশেষে ধরা পড়েছেন। হাওলা এবং মাদক চোরাচালানের আন্তর্জাতিক কারবারে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘদিন হাওড়ার শিবপুরে আত্মগোপন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ও বিভিন্ন রাজ্য পুলিশের দফতর দীর্ঘদিন তাকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজছিল হন্যে হয়ে। বাড়িতে কয়েক কোটি টাকার ব্রাউন সুগার, নগদ টাকা ও একটা ডাইরি পাওয়া গেছে। রাস্তার এক অর্ধ পাগল তাকে অবশেষে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছেন।

ধূর্জটিই টেলিফোন করে আমাকে খবরটা দিয়েছিল।

(বেহালা, কলকাতা)

ভালোবাসা কারে কয়

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

কলিংবেলটা বিচ্ছিরি শব্দে বেজে উঠল হঠাৎ। ঘ্যাঁ-এঁ-ৎ-

বিরক্তই হলাম মনেমনে। ধুৎ! কে এল আবার এ-সময়ে? দুধ, পেপার, কাজের মাসি-সবই তো এসে গেছে। আজ রবিবার, সুতরাং ময়লার গাড়িও নয়। তবে?

ছিটকিনি খুবে অবাক হলাম।

মেসোমশাই এসেছেন, অন্বেষার দাদু, বিনয়রঞ্জন দত্ত। অনেকদিন বাদে এলেন ভদ্রলোক। ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। কখনও বা মনে ভুলে মনে পড়লেও ভেবেছি, শরীরটা আর ভালো যাচ্ছে না নিশ্চয়ই। বয়েসও হয়েছে ঢের। এইট্টি প্লাস। এদিকটায় আর প্রাতর্ভ্রমণে বেরোনোর সাহস করেন না হয়তো।

নতুন জায়গায় সিফ্‌ট করার পর যোগসূত্রটা একাই রক্ষা করে আসছিলেন।

সময়-সুযোগ মিললেই এসে উঠবেন এখানে। বসে কিছুক্ষণ গল্প করে, এক কাপ গরম-গরম চা খেয়ে তবে উঠবেন। আগে কখনও এসে উঠতেন মাসিমাকে সঙ্গে নিয়েও। ইদানীং একা। মাসিমা মারা যেতেই খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। কথায় কথায় শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন একদিন। বললেন, একদিন দু-দিন তো নয়, বাষট্টিটা বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দেওয়া, কম দিন নয় কিছু। বয়েস বাড়লে একজন সঙ্গীর দরকার হয়। বার্ধক্যের দীর্ঘশ্বাস মোচন করবার জন্য।

সেও চলে গেল।

আমরা ওঁর অসহায় চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে।

উনি বলে চললেন।

ব্যস্ত সময়ের বাসিন্দা সবাই কিনা। বাড়তি সময় বলতে নেই কারুর হাতে। আমাদের সুখ-দুঃখের কথা কে শুনবে তবে আর? নাতিপুতিরাও এখন হাজার বই-খাতা বগলদাবা করে ব্যতিব্যস্ত। বড়ো হয়ে ওঠার জন্য ওদের আর দাদু-দিদার দরকার পড়ে না। বুড়ো-বুড়িরা এ যুগের অচল পয়সা যেন। বড়োই অপ্রয়োজনীয়। মিসফিট। ...

ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম হাসি জড়াই ঠোঁটে।

বলি, ভালো আছে, মেসোমশাই? অনেক দিন বাদে এলেন? মনেমনে বলি, এই এলেন, গপ্পবুড়ো। খেয়ে কাজ নেই। ওদিকে আমাদের এখন মরবার সময় নেই।

পালটা উত্তরে বিব্রত করলেন উনি। খোঁজ নাও কখনও? একবার তো ভুল করেও যাও না ওদিকে!

লজ্জবতীলতা সাজি অমনি। বলি, সত্যিই সময় হয়ে ওঠে না আর। যাব একদিন।

মেসোমশাইকে ডেকে সোফায় বসিয়েছি ততক্ষণে। কথা চালিয়ে যাচ্ছি একটা-দুটো। ও-পাশেই ওপেন কিচেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও আলপনাকে। রান্নাবান্না নিয়ে বেশ ব্যস্ত। অথবা ব্যস্ততার ভান। কেন-না অকটু আগেই কুরুক্ষেত্র বেধে গিয়েছিল দুজনে। প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে। অবশেষে মোবাইলটা মেঝেতে ছুড়তে রাগ কন্ট্রোলে এল। সে যাক গে, তবু একবারের জন্য মুখ বাড়াবে না এদিকে। কী আশ্চর্য! ভদ্রতা রক্ষা করার জন্যেও বলবে না, ভালো আছে মেসোমশাই?

এই এক দোষ আলপনার।

একবার রাগ হলে আর গোঁ-ছাড়বে না। হয় ঠোঁট ফুলিয়ে বাচ্চাদের মতো ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদবে; নয়তো মুখটাকে দিব্যি বাংলার পাঁচ করে কাটিয়ে দেবে ক-ঘণ্টা।

অথচ ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রেস্টিজিয়াস। আমরা ঝগড়াঝাঁটি করে মুখ ভার করে আছি-বুঝতে পারলে কী ভাববেন উনি? চিরকাল শান্ত-ভদ্র, ভালো মানুষ বলেই জেনে এসেছেন আমাদের।

মাথায় রাখতে হয় না বুঝি সে সব।

আমি ওর কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করলাম।

মেসোমশাই এসেছেন, অন্বেষার দাদু। দেখতেই তো পাচ্ছ। একবার কথা বলো। কী ভাববেন উনি? তা ছাড়া মাঝেমধ্যেই উঁকি মেরে তোমার মুখের দিতে তাকাচ্ছেন।

খারাপ কিছু আন্দাজ করছেন নিশ্চয়ই!

সাড়া দিল না কিন্তু আলপনা। খুন্তি নাড়াও থামাল না। তবে বোবা বা মুখগোমড়া করে কেসটাকে ফুল জন্ডিস করেও ছাড়েনি, এই রক্ষে। তরকারি নাড়তে-নাড়তেই মুখ ঘোরাল একবার। মেসোমশাইয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলও এক চিলতে। বলল, একটু বসুন মেসোমশাই। চা করছি।

এবার স্পষ্ট করে তাকালেন উনি রান্নাঘরে ব্যস্ত আলপনার মুখের দিকে। হেসে বললেন, ঠিক আছে।

কী চা খাবেন মেসোমশাই? দুধ না লিকার? গ্রিন টি আছে। খাবেন?

না-না, দুধ চা-ই খাব। ওইসব গ্রিন টি-ফিতে চলবে না আমার। বুড়ো হতে পারি, তবে রুগ্‌ণ নই। এখনও কোনও রোগই টুঁটি টিপতে পারেনি আমার। সঙ্গে চিনিও দিও। এক চামচ।

অবাক হয়ে তাকাল আলপনা অমনি। ভুরু কুঁচকে বলল, চিনি খেতেন না যে কোনোকালে আপনি? অন্তত যতদিন আমার হাতে-

আজ দিও। কিঞ্চিৎ হাসলেন মেসোমশাই।

চিনির নাম শুনে মটকা গরম হয়ে উঠল পুনর্বার আমার। আসলে সকালের যুদ্ধটা যে লেগেছিল ওই বস্তুটিকেই কেন্দ্র করেই। ভারী এক বদস্বভাব আলপনার। ঘরের দরকারি জিনিসের কথা একবারে বলবে না কখনও। বলবে অন্তিম মুহূর্তে। অর্থাৎ ভাত চাপাতে গিয়েই মনে পড়বে যে, চাল বাড়ন্ত, এক্ষুনি আনতে হবে। অথবা তরকারি করবে, কড়াই চেপেছে উনুনে। অমনি খেয়াল হল ঘরে আলু নেই একটিও। কিংবা তেলের ডিব্বা শূন্য। আর কী! ল্যাজ তুলে ছোটো তৎক্ষণাৎ।

তো, কার না রাগ হয়?

আজ পড়িমরি করে বাজারটা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মনে পড়ল ওর চিনির কথা। এক হাত জিভ বার করে বলল, যাঃ ভুলে গেলাম বলতে। ঘরে একফোঁটা চিনি নেই যে। কেউ যদি আসে? চা করতে হয়? তখন?

তখন তুমি ছুটবে; আবার কী! আমি রাগত স্বরে জানাই। এই বাজারের ব্যাগটা রাখলাম। ক্ষমা করো আমায়। আর নড়তে-চড়তে বলো না প্লিজ! তোমার এইসব বদখত কাজকারবার মোটেই ভালো লাগে না আমার। কেন, টেবিলের উপর ছোটো ডাইরিটা রাখি। কতদিনও বলেছি, যা লাগবে আগেভাগে লিখে রাখবে। সময়ে সব মিলে যাবে। লিখবে না কেন তবে? কীসের কষ্ট?

আলপনাও চিংড়ির মতো লাফাল অমনি।

বিচ্ছিরি মুখভঙ্গি করে তাকাল আমার উত্তেজিত মুখের দিকে। মেজাজ তিরিক্ষি করে বলল, বেশ। কেউ এলে আমিও চিনি বাদে চা খাওয়াব। বলব, ঘরে চিনি নেই। আনতে অপারগ আমার অকর্মণ্য স্বামীদেবতা। কী, ভালো লাগবে তখন শুনতে? সম্মান যাবে না তো?

শুনে টং করে রাগ মাথায় চড়ল আমার।

হাত-পা ছুড়ে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিলাম। গলা ফাটাই। বলি, উলটোসিধে বকবে না! একদম চোপ! আমাকে চাকর ভাব একটি, তাই না। তোমার কথায় উঠ-বোস করব রাদ্দিন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই করতে হবে। এটাই সংসারের নিয়ম। তবে সংসারটি পেতেছ কেন? কে তোমায় হাতে-পায়ে ধরেছিল শুনি?

ধ্যাত্তেরি! নিকুচি করেছে সংসারের। বলে তেড়ে যাচ্ছিলাম ওর দিকেই। পরে ব্রেক কষলাম। সব রাগ গিয়ে পড়ল টেবিলের উপর রাখা মোবাইলটার উপর। সেটি এখন ভেঙে কয়েক টুকরো। ব্যাটারিটা ব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে পাইপের ফুটো গলে ড্রেনে ঝুপ্পুস।

ততক্ষণে কাঁদতে বসে গেছে ও।

সঙ্গে রাজ্যের অকথা-কুকথা। আমি আর কর্ণপাত করতে চাইলাম না। পাছে মেজাজটি পুনর্বার সপ্তমে চড়ে। আবারও যুদ্ধে মাতি। টেবিলে বসে খবরের কাগজটায় চোখ বোলানোর চেষ্টা করে গেলাম খানিকক্ষণ। লাভ হল না যদিও কিছুই।

মস্তিষ্ক এতটাই জ্যাম হয়ে আছে তখন, কোনো খবরই প্রবেশ করতে পারছিল না সেখানে।

সম্পর্কটা আপাতত যা দাঁড়িয়েছে আমাদের, প্রকৃতই চিনির বড়ো টানাটানি।

সম্পর্কের মধুরতা বলতে কণামাত্র অবশিষ্ট নেই আর। দিবারাত্রি কথার কুস্তিতেই কেটে যাচ্ছে দুজনের। দিনান্তে কেউ-কারোর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। কথা যে-টুকু চলছে, আকারে, ইঙ্গিতে। দুটি মুখের দিকে তাকালে কারোর মনে হতেই পারে-মানুষ নয় এরা, প্যাঁচা দুটি। এক-এক সময় ভারী নাভিশ্বাস উঠে যায়। বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভাবি, হে ভগবান! এর নাম সংসার! এরই নাম দাম্পত্য সুখ! তবে অসুখ কাকে বলে?

সাইন্স বলে পজিটিভ-নেগেটিভ আলো জ্বলে; না নেগেটিভ-নেগেটিভ, না পজিটিভ-পজিটিভে। আমাদের অবস্থা তেমনই কিছু একটা। দাম্পত্য জীবনের

এক-কুড়ি বয়েস হতে চললেও তেমন করে আলো জ্বলল না কোনোদিনই। জ্বলার কথাও নয়। দুজনের প্রকৃতিই যে ফুল নেগেটিভ। দুজনেই সেন্টিমেন্টাল, শর্ট টেম্পার্ড। দুজনেরই ধৈর্যশক্তি তলানিতে। অথবা একজন যদি তেল হই, অপরজন জল। মিশ খায় কেমন করে তবে! আমি যদি চলি উত্তরে; ও দক্ষিণে। আমি আদা; ও কাঁচকলা। আমি সাপ তো, ও নেউল।

তবে ঐক্যের সুর বাজে কোনোদিনও!

ভাবতে বসলে অবাক হই।

আমাদের দুজনের যে ভালোবেসেই বিয়ে। সুদূর অসমে পালিয়ে গিয়ে। তারপর একমাস বাদে দুরুদুরু বক্ষে ঘরে ফেরা। সঙ্গে দিদি-জামাইবাবু। না, অপ্রত্যাশিত ঘটনা কিছু আর ঘটেনি। তবে প্রত্যাশিত এবং অধিকৃত বস্তুটিকে ঘাড়ে লটকে সেই থেকে বেজায় বিপদে আছি। কোনোদিনও এই বিষফোড়া ব্যাথামুক্তি দেবে তেমন আশা নেই। তবু এভাবেই দিন গুজরান। দিনগত পাপ ক্ষয়।

কবিগুরুর কবিতা মনে আসে, 'মুক্তি, ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?'...

মেসোমশাই হেসে উঠলেন। হাসলে বেশ লাগে এখনও ওঁকে। একটিও দাঁত অবশিষ্ট। তবু। ওঁর দিকে কখনো-কখনো ভাবি, শ্যামলাপারা এমন মিষ্টিমুখ বুঝি কেষ্ট ব্যাটারাই ছিল একমাত্র।

হ্যাঁ বলছি তো চিনি দিও। এদ্দিন খেতাম না এখন খাই।

আলপনা তাকিয়ে আছে মেসোমশাইয়ের মুখের দিকে। ওর সবাক দৃষ্টি। বুঝে উঠতে পারছে না রহস্যটা ঠিক। আগে খেতেন না, এখন খান। সবাই তো সুগার হলে চিনি খাওয়া ছাড়েন। তবে উনি?

মেসোমশাই তেমনি হাসেন। বুঝলে কিনা, চিনি ছেড়েছিলাম, সে এক কারণে। তবে এখন আর খেতে বাধা নেই। সেসব চুকেবুকে গেছে।

কেন, মেসোমশাই? কেন খেতেন না চিনি? প্রশ্ন করে তাকিয়ে আছে আলপনা তখনও মেসোমশাইয়ের রহস্যমোড়া চোখ দুটির দিকে। এখন বা কেন আবার খাওয়া শুরু করলেন? ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়! কারণ শুনি?

এপাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক আমিও। বললাম, সুগার ছিল নিশ্চয়ই আগে! এখন কন্ট্রোলে?

না দিবাকর, তা নয়। সুগার আমার কোনোকালেই ছিল না। এখনও নেই।

তবে? দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলাম। মাঝেমধ্যে কেউ ঘরে আসার উপকারিতাও আছে কিছু। নিজেদের ঝগড়াবিবাদ সব ভুলে যাওয়া যায় ওই ফাঁকে। আমার সকৌতুক দৃষ্টি আলপনার দিকে। ওরও।

মেসোমশাই বললেন, আমি চিনি খেতাম না তোমার মাসিমার জন্য।

মাসিমা! মানে? আমাদের কৌতূহলী চারটি চোখ ওনার দিকে।

এর তো সুগার ছিল। হাই সুগার। যে-কোনো প্রকার মিষ্টিই বারণ ছিল। তো, আমি খাই কেমন করে? ওকে ফেলে? দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়েছি এভাবেই। এখন তো ও নেই। চলে গেল আমাকে একা রেখে। আর কোনো বাধা নেই!

মেসোমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা স্তব্ধ। বাক্যরহিত।

মেসোমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটি। সেটি আমার শরীরে এসে চাবুকের মতো আঘাত করল যেন। তাঁর অল্প হাসিজড়ানো মুখটির দিকে আমি বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ।

উঠি তবে? চায়ের কাপটি টেবিলে রেখে বললেন মেসোমশাই।

ওঁকে এগিয়ে দিতে আমরা উঠে দাঁড়াই। দরজায় মুখ বাড়িয়ে ওঁর চলে যাওয়া দেখি। এরপর পরস্পর-পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই। বাক্যহীন। নিষ্পলক।

কতদিন এভাবে দেখিনি দুজন-দুজনকে।

আচমকা নিজের প্রতি ধিক্কার জানাই। ইশ্! এ কী চেহেরা হয়েছে আলপনার। ওর দু-চোখের কোণে কালি। রুক্ষ চুল। মুখভরতি ক্লান্তি। নিশ্চিত, ঘরে চলা নিরন্তর ঝগড়া-অশান্তিরই ফল এ। আহা! জল-আলো-বাতাসের অভাবে একটা সবুজ গাছ কেমন শুকনো ডালপালা ছড়াচ্ছে-খেয়ালই করিনি অ্যাদ্দিন।

(স্বামীজি সড়ক, বেহালা, কলকাতা)

নরহরির ইতিবৃত্ত

ডা. বিপদতারণ দাস

নরহরি দত্ত সরকারি অফিসের একজন দক্ষ এবং সৎ কেরানি, ইদানিং এই কেরানিকুলকে আর কেরানি বলে অসম্মান করা হয় না, এনাদেরকে কিছুটা জাতে উঠিয়ে অফিস অ্যাসিসট্যান্ট নামে সম্মানিত করা হয়েছে। অফিস এবং অফিসের বাইরে নরহরি দত্ত, হরিবাবু বা হরিদা নামেই অধিক পরিচিত। আগেকার দিনের মতো মাছিমারা কেরানি নয়, কম্পিউটারে রীতিমতো পোক্ত হয়ে ওঠা সরকারি অফিসে ক্রমশ লুপ্তপ্রায় প্রজাতিদের অন্যতম একজন। সংরক্ষণে প্রমোশন পাওয়া আধিকারিক থেকে নীচুতলার কর্মী সকলেরই ভরসা হরিবাবু।

নরহরি নিজের নামের প্রতি সুবিচার করে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই লোকের ফাইফরমাশ খেটে দেওয়া বা যে কোনো কাজ নিঃস্বার্থভাবে করে দেওয়াকে পরোপকার বলেই বিবেচনা করত, এতে নরহরি নির্বিকার থাকলেও অফিসের কতিপয় সহকর্মী, ভিতরে ভিতরে অনেক খেলা চলছে মনে করে আড়ালে-আবডালে আলোচনা করতো তা হরির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মুহূর্তকাল অনুরণন হয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে যেত।

দাদার পরিবারে মা এবং বোনসহ যৌথ পরিবারের মতো সকলে মিলমিশ হয়ে বাস করত, ওদের পরিবারে ঝগড়া বা অশান্তি হতে হরির প্রতিবেশী বা পরিজনদের কাছে কোনোদিন শোনা যায়নি। বেশ ক-বছর সরকারি দপ্তরে চাকরি করলেও নিজে বিয়ে করা আবশ্যক বা তাগিদ অনুভব করেনি, পরন্তু তার ছুটির দিন বা অবসর বিনোদন বলে কিছু ছিল না। অফিসের সময়টুকু ছাড়া রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বাড়ির সকলের আবদার-ফরমায়েশ হাসিমুখে সম্পন্ন করে অবকাশ পেলে অফিসের অতিরিক্ত কিছু কাজ বাড়িতেই করে নিত। করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে তার ছুটি মিলত। মাঝে মধ্যেই মশারি না-টাঙিয়ে অথবা প্রচণ্ড ঠান্ডায় লেপ বা কম্বল ঢাকা না-নিয়েই কুণ্ডলী পাকানো সারমেয়র মতো ঘুমিয়ে পড়ত।

আজকালকার দিনে সমাজে এবং সংসারে মানুষ নামের বুদ্ধিমান জীবটি আপন প্রয়োজন যতটা বোঝে কিংবা অপরের সাহায্য যতটা প্রয়োজন ততটাই গ্রহণ করতে হবে প্রতিদানে সমাজ কিংবা মানুষের পাশে থাকার আবশ্যকতা মনে করে না। বিধাতাপুরুষ হরির মতো এমন একজন সরল, নিষ্পাপ পরোপকারী মানুষকে এইরকম স্বার্থপরায়ণ সংসারে কেন যে পাঠিয়েছেন তা ওর কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ না-করলে সহজে বিশ্বাস হবে না।

নরহরিরা পাঁচ ভাই এবং এক বোন গ্রামের বাড়িতেই বড়ো হয়ে ওঠে, মাটির দোতলা বাড়ি, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক চিলতে উঠোন, বাবার সামান্য ব্যাবসা এবং অল্প কৃষি জমি। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাইয়ের পড়াশোনায় মতিগতি একেবারেই ছিল না, বড়ো ভাই ওই তিন আহাম্মককে টেনে-হিঁচড়ে দশম শ্রেণি পর্যন্ত নিয়ে গেলেও মাধ্যমিকের সীমানা পার হতে পারেনি। নরহরি, বড়দাদা এবং বোন তিনজনেই পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী এবং বুদ্ধিসুদ্ধি ভালোই ছিল কারণ অত অভাবের মধ্যে পড়াশোনা করে গ্রামের বিদ্যালয়ে ফি বছরই ভালো রেজাল্ট করত। হরিরা ক্রমে সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, বড়দাদা কলেজের অধ্যাপক, বোন স্কুল শিক্ষিকা এবং ঈশ্বর বোধহয় নিজ ইচ্ছাপূরণে হরিকে কেরানি করেই এ সংসারে পাঠিয়েছেন। অন্য তিন ভাই সৎপাত্র 'গঙ্গারাম'-এর ভাইদের মতো-একটা গোঁয়ার, একট আধপাগল আর-একটা গানবাজনা নিয়ে করেকম্মে নিজ সংসারধর্ম প্রতিপালন করত। বাবা-মা গত হয়েছেন, হরি এবং বোন, দাদার সংসারে ঠাঁই পেলেও গ্রামের ভিটেবাড়ি, জমিজমা, পুকুরের অংশ যা ছিল সেসব দেখাশোনার জন্য হরিকে প্রায়শই গ্রামের বাড়িতে যাতায়াত করতে হত।

গ্রামের বাড়ির পাশেই ছোটো একটা পুকুর ছিল, গ্রামেরই এক জেলে কালিপদকে মাছ চাষ করা এবং দেখাশোনার জন্য লিজ দেওয়া ছিল। মাঝেমধ্যে গ্রামে গেলে কালিপদ খেয়াজাল ফেলে হরিকে মাছ ধরে দিত। কালিপদ ওদের পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছিল এবং ওরা কালিপদকে কালো কাকা বলে ডাকত। হরির একবার ইচ্ছা হলো নিজেই জাল ফেলে মাছ ধরবে, কালিপদ জাল এনে হরিকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে

ড্রাইভিং ট্রেনারের মতো পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। হরি জালটা একপাক ঘুরিয়ে যেই পুকুরে ছুড়েছে, কালিপদ আর যারা কাছাকাছি উৎসুক হয়ে মাছ ধরা দেখছিল, তারা দেখল জালটা উড়ে এসে পাড়েই পড়ল আর ঝপাং করে একটা শব্দ শুনতে পেল, তারপরেই সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখল হরি পাঁকপুকুরের তলা থেকে রুই-কাতলার মতো বুজবুজি কাটতে কাটতে উপরে উঠে আসছে, ভাগ্যিস সাঁতার জানত না-হলে সেদিনই হরির সলিল সমাধি হয়ে যেত।

ছোটো থেকেই হরি পড়াশোনায় বেশ আগ্রহী ছিল সেইসঙ্গে অনেক বদবুদ্ধিও ছিল। একবার পঁচিশে বৈশাখের দিন সকালে বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান শেষে হরির দুই সহপাঠী তরু এবং হীরে, হরির সঙ্গে চুপিচুপি যুক্তি করল আজ সতীডাঙার বাগানে আম পাড়তে যাবে। তরু-হীরে এক্কেবারে বিচ্ছু যাকে বলে, গ্রীষ্মের ঠা-ঠা দুপুরে জনহীন মাঠে তালগাছে চড়ে তালের কাঁদি কেটে কচি তালশাঁস খাওয়া তো কখনও লুকিয়ে ছিপ ফেলে অন্যের পুকুরে মাছ ধরা এরকম অসংখ্য গ্রাম্য ডানপিটেপনায় ওরা দুজন ছিল বেপেরোয়া। হরি খানিক ভয় পেলেও ওরা অভয় দিয়ে বলল, 'চল আমরা তো আছি, তোর ভয় কীসের? তা ছাড়া অধা হাড়ি তো এখন গাঁয়ের বাড়িতে।'

পাশাপাশি আরও গ্রাম থাকলেও প্রধানত তিনটে গ্রামের মাঝে কয়েক বিঘা জায়গাজুড়ে সতীডাঙার বাগান, ভিতরে গোটা তিনেক ছোটো-বড়ো পুকুর, দু-চারটে অন্যান্য ফলের গাছ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বঁইচি ফলের বন আর বেশিরভাগই আম গাছ। বাগান ঘিরে কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দক্ষিণের গাঁয়ে, পশ্চিমে মেঠো পথ ধরে একটু এগোলেই বাঁকা নদীর ঘাট, একপাশে শ্মশান, ঘাট পার হয়ে কিছুটা গেলেই অধা হাড়িদের গ্রাম, পুবে সবুজ ঘাসে ঢাকা খেলার মাঠ, তারও পরে চাষের জমি। মাঠের পশ্চিম গা বেয়ে পায়ে হাঁটা পথ গিয়ে মিশেছে বাঁকা নদীর উপর ছোট্ট সেতুতে। সেতুর পরে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা গিয়ে মিশেছে আরও একটি ইট-পাথরের রাস্তায়, এই রাস্তা ধরে ডানদিকে একটু এগুলে রামপুর বাসস্ট্যানড, হরিদের হাইস্কুল, সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আর ঠিক উলটো দিকে কিছুটা গিয়ে বাঁকা নদীর উপর আরও একটা পুরোনো জীর্ণ সেতু পার হলে হরিদের গ্রাম গোপালপুর।

অধীর হাড়ি ওরফে অধা হাড়ি এলাকার বিখ্যাত সতীডাঙার আমবাগানে বেতনভুক পাহারাদার, বিশেষত আমের সময় তিন-চার মাস তালপাতার ঘর বানিয়ে দিনরাত ওখানেই থাকত। ইয়া বড়ো একখানা লাঠি হাতে বাগানের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টহল দিত। বাগানে দোপেয়ে নিজ প্রজাতির কাউকে দেখলেই ডাকাত সর্দারের মতো হুংকার ছাড়ত কে? কে রে? কে রে? তারপরেই তেড়ে আসত, তরু-হীরে খুব ভালো করেই জানত ওই সময়টায় অধা হাড়ি বাগানে থাকে না, তাই হরিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের দিকে দিল ছুট।

বাগানে পৌঁছেই তরু-হীরে আগে থেকে চিহ্নিত করে রাখা কাঁচা-মিঠে গাছে শাখামৃগের মতো তরতর করে উঠে পড়ল। গাছভরতি আম দেখে উল্লসিত হয়ে অবাধে পটাপট ছিঁড়ে নীচে ফেলতে থাকল। হরি জামা-গেঞ্জি খুলে একপ্রান্ত গিট বেঁধে থলির মতো করে টপাটপ ভরতে থাকল আর মাঝেমধ্যে বাঁকার ঘাটের দিকে লক্ষ রাখল। হঠাৎ দেখতে পেল অধা হাড়ি বাঁকার ঘাট পার হয়ে হন্তদন্ত হয়ে আসছে, তারপরেই হরিকে দেখতে পেয়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো হুংকার ছাড়তে ছাড়তে তেড়ে আসছে আর শব্দবান ছুড়ছে কে রে? কে রে? ধরতে পারলে মেরে ফেলব। শব্দবান হরিদের বুকে শূলের মতো বিঁধছে। হরি আমের পুঁটুলি কোনোরকমে এক হতে বাগিয়ে ধরে তরু-হীরেকে নামতে বলে দে ছুট। অধা হাড়ি ছুটছে আর ওরা তিনজনে উলটোদিকে সেতু পার হয়ে রাস্তা থেকে নেমে মাঠের উপর দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে।

অধা হাড়ি তখন চল্লিশের কোঠায় আর ওরা সবে কিশোর তাই দুরন্ত কৈশোরের কাছে দমের দৌড়ে অধা হাড়ি পিছিয়ে পড়লেও ধর! ধর! শব্দ করতে করতেই ছুটতে থাকল। ওরা তিনজন মাঠ শেষ করে বাঁকা নদীর হাঁটুজল পার হয়ে ওপারে নিজেদের গ্রামে পৌঁছে এক জায়গায় বসে দেখল অধা হাড়ি তখনও অনেক দূরে তাই কিছুক্ষণ বসে দম নিয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকে গেল। অধা হাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে বাঁকার ধারে এসে ওদেরকে দেখতে নাপেয়ে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে গেল।

যৌথ পরিবারে হরি সকলের অন্তরে যেরূপ ঠাঁই পেয়েছিল ইচ্ছা করলে দাদার সংসারে নিরুদ্‌বেগে জীবন

কাটিয়ে দিতে পারত, তবু সরকারি চাকুরি ছাড়াও কয়েকটি প্রাইভেট টিউশনও করত, তা হরি গোপন রাখার চেষ্টা করলেও মুখে মুখে রটনা হয়ে যেত। তবে কেন যে অধিক উপার্জন করবার তাগিদ অনুভব করেছিল, তার সরল মনের জটিল অন্তঃকরণে কি খেলা চলছিল তা অন্য কারোরই জানার অসাধ্য ছিল।

বাড়ির অন্য যাদের বিবাহ হওয়ার ছিল সকলেরই এমনকি ভাইপো-ভাইঝিরও যথাসময়ে সম্পন্ন হয়ে গেলে আত্মীয়স্বজন, সকলে মিলে হরিকে বিবাহ করবার জন্য চাপাচাপি করল। তারা যুক্তি দিয়ে হরিকে বোঝাল, 'দাদা-বউদি তো চিরকাল থাকবে না, যখন বয়স বাড়বে এখনকার মতো তো সকলের মন জুগিয়ে চলতে পারবে না, তখন হয়ত তোমার প্রয়োজনে বা দুঃসময়ে আপনার বলতে তোমার পাশে কাউকেই পাবে না।' এতদিন যাবৎ সংসার সমুদ্রে অর্ধনিমজ্জিত থেকে হরির মগজে এই যুক্তি অকাট্য মনে হওয়ায় বিবাহে সম্মতি দিয়েছিল তবে একটা শর্তসাপেক্ষে- 'তার পছন্দ করা মেয়েকেই সে বিবাহ করবে।' সকলেই কিছুটা বিস্মিত হলেও কারোর কোনো আপত্তি ছিল না।

হরির সঙ্গে তারই এক ছাত্রীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নাই। ছাত্রী বাংলা সাহিত্যে সম্মান নিয়ে সম্মানের সঙ্গে পাস করার পর হরির সঙ্গে মাঝেমধ্যে বাইরে বের হত তা কারও কারোর নজরে পড়েছে কিন্তু তারা আপনি আপনিই ভেবে নিয়েছে যে হরি নিশ্চয়ই মেয়েটির কোনো উপকার করবার জন্যই ওর সঙ্গে যাচ্ছে। যাই হোক উভয় পক্ষের কিছু বাদানুবাদের পর ওই মেয়ের সঙ্গেই হরির বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।

বিবাহের পরও হরির চরিত্র বা মানসিকতার কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি, ওটা তার আধুনিকমনস্কা, শিক্ষিতা, তরুণী ভার্যা অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেনি। আপন পতি উপার্জনক্ষম এবং সাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও পরাশ্রয়ী এবং পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে কেন? এতদিন ধরে মনের মণিকোঠায় লালিত হওয়া স্বপ্নকুসুম রঙিন প্রজাপতি হয়ে ডানা মেলতে দেব না কেন? সদ্য বিবাহিতা তরুণী স্ত্রী সুন্দরী এবং গুণবতী হলেও তার এরূপ আচরণ হরি বরদাস্ত করেনি এবং জীবনের শুরুতেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছে এই বলে-'এরকম স্বার্থপর মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে কারণ জীবন থাকতে আমি দাদাকে ছেড়ে যেতে পারব না, বরং প্রয়োজনে তোমাকে ছাড়তে পারি।' যাকে জীবনসঙ্গী ভেবে এতদিন যাবৎ অন্তরের অন্দরে ঠাঁই দিয়ে এসেছিল তার এরূপ রূঢ় বাক্যবাণে কোমলস্বভাবা, সংস্কৃতিমনা, স্বল্পভাষিণী স্ত্রী চন্দনা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিল এবং তার সমস্ত আবেগকুসুম আকাশকুসুম ভেবে অন্তরের কুটুরিতে বন্দি করে রেখেছিল আর কখনও বের হতে দেয়নি।

হরির অর্ধাঙ্গী চন্দনা মুক্ত মনে ডানা মেলতে না-পেরে তার অন্তরের বন্দিদশায় মানসলোকে তোলপাড় হলেও বাহ্যিক হাসি-আনন্দেই সংসার প্রতিপালন করত। তাদের একমাত্র পুত্র ডাক্তার হল কিন্তু অত্যন্ত হৃদয়বিদারক যা, তা হল পুত্রের ডাক্তার হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা কিংবা একমাত্র পুত্রের বিবাহ দেখে যেতে পারল না, হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দাম্পত্য জীবনের সমস্ত অবদমন জলাঞ্জলি দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করল।

মায়ের প্রতি বাবার এরূপ অবমাননাকর আচরণ ডাক্তার পুত্র অয়ন মেনে নিতে পারেনি। মায়ের মৃত্যুর পর সেও সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে চাকুরিস্থলে চলে গেল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবাকে তাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা বললে হরি অসম্মত হল। দাদা-বউদি জীবিত থাকলেও তাদেরও বয়স হয়েছে, হরিও চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। আত্মীয়স্বজন যা পূর্বেই আশঙ্কা করেছিল হরির অদৃষ্টে তাই-ই ঘটল, সে বিষম অসুখে পড়ল। তার নিজ অর্থবল থাকলেও সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করবার মতো অন্তরের মানুষের অভাবে হরির কোমল পরাণ নীরবে বের হয়ে গেল, এতে জগৎ-সংসারে কারোর কিছু ক্ষতি হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

(খাজা আনোয়ার রোড পশ্চিম
শ্রীপল্লী, বর্ধমান)

ভাগাবান্দ গ্রামে রাতদিন
অপূর্ব মিত্র

সাঁওতাল পরিবারের বছর কুড়ির এক সুস্বাস্থ্যবতী যুবতী মাটির ঘরের বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। শরীরে জড়ানো বিবর্ণ মলিন একটা গামছা। কোনো মতে শরীরটা ঢাকার অহেতুক একটা প্রচেষ্টা। ওটা জড়ানো, আর না-জড়ানোর মধ্যে বিশেষ কোনো ফারাক নেই। মেয়েটা আমাদের দেখে লজ্জায় একবার ঘরে গিয়েও... শেষে আবারও সে আগের মতোই বারান্দায় এসে বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম অভুক্ত পেট বড়ো নিষ্ঠুর; লাজলজ্জা, মান সম্মান কোনো কিছুই আজ তাঁকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে না।

সান্টুদের দেশের বাড়ি বাঁকুড়ার এক অজপাড়া গাঁয়ে। গ্রাম ভাগাবান্দ। সময়টা ১৯৭৯ সালের জুলাই মাস, সান্টু বলল, 'চল্ আমাদের দেশের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসবি। ওখানে নতুন একটা খড়ের চালার মাটির দোতলা বাড়ি বানানো হয়েছে। চল্ একবার দেখে আসবিখন।'

তখন আমাদের উঠতি বয়স। একেবারেই বেকার। ওই বয়স পর্যন্ত দূরে কোথাও কখনও ঘুরতে যাইনি। তবে বহু দিনের বাসনা, মাটির গৃহে একটা রাত অন্তত কাটানো। হঠাৎ করে সেই সুযোগটা যখন চলেই এল, তখন দ্বিতীয় বার আর চিন্তাভাবনা না-করে, সান্টুর কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

পরের দিনই সান্টুর স্কুটার 'বিজয়' ছুটল দুর্গাপুর হয়ে বাঁকুড়ার এক অজ পাড়াগাঁ ভাগাবান্দের পথে। তবে যাওয়ার পথে নানা কারণে রাস্তায় অনেকটা সময় বিলম্ব হওয়ায়, সান্টু বলল, 'চল জয়পুরের জঙ্গলের শর্টকার্ট পথটাই ধরি, কী বলিস।'

মৌনব্রত অবলম্বন করে মনে মনে ভাবলাম, আমার তো কোনো ধারণাই নেই, আমি আবার কী বলব? শুনেছিলাম সেকালে দিবারাত্রি সব সময় পুলিশ পাহারায় জয়পুরের জঙ্গল পেরোতে হত। সান্টু কোনো কিছুর তোয়াক্কা না-করে, একেবারে ভরা সায়াহ্নে গভীর জঙ্গলের বিপদসংকুল পথকেই বেছে নিল। জঙ্গলের ভিতরে মাকড়শার জালের মতো গোলক ধাঁধায় সব পথ। সেই পথে পাক খেতে খেতে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। উৎভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত, দিশেহারা ও শেষে একেবারে নিরুপায় হয়ে একসময় সান্টু বলে উঠল ...

'মনে হয় পথটা ভুল করেছিরে'।

কথাটা শুনে কানে যেন বেসুর করুণ সুর বেজে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, 'এই গভীর জঙ্গল থেকে শেষ পর্যন্ত বের হতে পারব তো?' স্কুটারের পিছনে বসে ইষ্ট দেবতার নাম জপতে লাগলাম। তারপর নানা ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে... একসময় বাধাবিপত্তি সব কেটে গেল। অবশেষে জঙ্গল পেরিয়ে গাঁয়ে একটা মাটির বাড়ির পাশে এনে স্কুটারটা দাঁড় করাল। ততক্ষণে অবশ্য চারদিক মিশমিশে আঁধারে গ্রাস করেছে।

সান্টু পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে... তবে বিড়িটা ধরানোর আগে বিড়ির পিছনে ফুঁ দিয়ে ভিতরের ছাই পাউডার পরিষ্কার করে নিল। একটা দেশলাই কাঠি খ্যাস স্বশব্দে জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত কাঠির ঝলকানির আলোতে, সান্টুকে এক ঝলক দেখে মনে হল যেন একেবারেই চাপ মুক্ত। জঙ্গল জয়ের তৃপ্তি ওর চোখে মুখে তখন ফুটে উঠেছে। অবশ্য সারাদিনের যা ধকল গেছে... গভীর জঙ্গলে প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ছিল মৃত্যুর হাতছানি। এবার বিড়িটাকে তড়িঘড়ি তিন টানে শেষ করে বাড়ির বাইরে থেকে সান্টু হাঁক দিল...

'বনমালী, বনমালী।'

ওর বাজখাঁই গলা। চারদিকের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হল। সঙ্গে সঙ্গেই গৃহের ভিতর থেকে ...

'আজ্ঞা, যাই বাবু।'

সান্টু ফিসফিস করে জানাল- 'বনমালী আমাদের প্রধান ভাগচাষি। ওনার কাছেই আমাদের বেশিরভাগ জমি চাষের জন্য দেওয়া আছে; বাকিটা অন্য আর-এক ভাগচাষি কালাহীরার কাছে। তবে কালাহীরার বাড়ি এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। পাশের গাঁয়ে। সাঁওতাল পাড়ায়। কালকে সে সব তোকে দেখাব খন।'

বনমালীর বাড়িতে ওই রাতের ভোজের ব্যবস্থা। রাত দশটা নাগাদ ভোজ পর্ব মিটলে সান্টু বলল-

'চল্ এবার নতুন বাড়িতে ঘুমোতে যাই।'

মাটির দোতলা বাড়ির কথা সান্টু আগেই জানিয়ে ছিল। পথ এগিয়ে দিতে বনমালী বাঁহাতে হারিকেন ঝুলিয়ে আমাদের আগে আগে চলল। ওর পিছে পিছে আমরা। বনমালীর বাড়ি থেকে সান্টুদের বাড়ি খুব একটা

দুরে নয়। চারদিক একেবারে ঘুটঘুট করছে অন্ধকারে। বেশ কিছুটা দূরে দূরে হাতে গোনা কয়েকটা মাটির বাড়ি। জোনাকি পোকার মতো হ্যারিকেনের মিটমিটে আলো খুপরি জানালা দিয়ে বাইরে এসে পড়েছে। নির্জন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সান্টু জানাল-

'জানিস ঘরটা তৈরি হওয়ার পর, বাড়ি থেকে এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি। আমি আর তুই...'

আমি-'তবে আজই কি প্রথম' উত্তর দিল-'হ্যাঁ'

আমরা তখন তরতাজা যুবক। এক ঘুমেই ভোর হয়ে যায়। কাকভোর থাকতে থাকতেই জঙ্গি মশারা দায়িত্ব নিয়ে ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। ঘরের এক কোণের কাঠের পোক্ত মই। সেই মই বেয়ে গৃহের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সান্টু আমার আগেই উঠে পড়েছে। গ্রাম্য মানুষেরা কাকভোর থাকতে ঘুম থেকে উঠে থাকে। ইতিমধ্যে যে-যার দৈনন্দিন কাজে...কেউ ব্যস্ত কৃষিকাজে, কেউ বা খামারে কেউ আবার বা একটু আড়ালে-আবডালে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত।

গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখে আমি তো অবাক! আমি নির্বাক! আমি বিস্মিত। আমি একেবারেই 'থ'। বিস্ময়ে চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে... ভাবছি, সামনে যা, যা দেখছি সব সত্যি তো? স্বপ্ন নয় তো? সত্যিই কি বাস্তব? নাহ্, আমার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই দুরূহ! বাস্তবিকই সে এক অপূর্ব দৃশ্যপট।

ওই গাঁয়ের একদিকে ঘন সবুজ বনাঞ্চল, অন্যদিকে উদ্ভিদ বিহীন রক্তিম সিঁদুরে মৃত্তিকা, মাঝের অংশে ফুটিফাটা এক ফসলি এঁটেল মাটির ধানি জমি আর পিছনের দিকে কাচ স্বচ্ছ তিরতিরে ধারায় বহে চলা দ্বারকেশ্বর নদ। অপূর্ব। নয়নাভিরাম সেই দৃশ্য। ভাষায় প্রকাশ করা...না, না... একমাত্র উপলব্ধিই শেষ কথা।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তিম বর্ণের মৃত্তিকার উপরে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে টকটকে রাঙা আভা বিকিরণ হতে লাগল। ওই মৃত্তিকার দিকে তাকালেই চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যায়। তবুও অবাক বিস্ময়ে একরকম জোর করেই সেই দিকে চেয়ে রইলাম। অজান্তেই অন্তর থেকে বেরিয়ে এল...

'ওম বসুন্ধরায় বিদমহে ভূতধাত্র ময় ধীমহি তন্নো ভূমিহ প্রচোদয়াত্'।

তখন সবে সকাল ন-টার কাছাকাছি, ইতিমধ্যে সূর্যদেব রুদ্র মূর্তি ধারণ করছে। বাইরে চাঁদিফাটা রোদ। সান্টু বলল-

'গতকাল তোকে আমাদের এক সাঁওতাল ভাগচাষি কালাহীরার কথা বলেছিলাম না? চল্ একবার ঘুরে আসি। ওই পাশের গাঁয়ে থাকে। বহুত দিন হল কোনো টাকা পয়সা দেয় লাই বটে। চল তো উস্‌সুল করে লিয়ে আসিখন। ব্যাটা বহুত বদমাশ বটে।'

আমি- 'সেটা আবার কত দূর? সান্টু-পাশের গাঁয়ে হেঁট্যে হেঁট্যেই যাবকখন। খুব বেশিক্ষণ লাগবেকলাই বটে। চল্ তো।"

লক্ষ করলাম সান্টুর মাঝে মাঝে কথা বলার সময়, 'বাঁকড়া' ভাষা মিশে যাচ্ছে। তবে আমার প্রতি সদা সতর্ক। খাতির যত্নের যাতে কোনোরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না-ঘটে সে দিকে সদা প্রস্তুত।

বেলা তখনও ঠিক মতো হয়নি, এরই মধ্যে ধরিত্রী যেন সাংঘাতিক তপ্ত। ওই রৌদ্রের মধ্যে দিয়েই মিনিট কুড়ির হাঁটা... কিন্তু উপায় নেই; অগত্যা চলা। তবে চলতে চলতে বেশ কয়েকটা ফুটিফাটা মাঠ পার করতে গিয়ে বুঝলাম গলা শুকিয়ে এক্কেবারে কাঠ। তীব্র দাবদাহের মধ্য দিয়ে যেতে গিয়ে মনে হচ্ছিল যেন গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে। ভুঁই ফুঁড়ে তাপ উপরের দিকে উঠে আসছে। দূরের দিকে তাকালে বাতাসে ঝলকানির একটা কম্পন; অনেকটা উনুনের গনগনে আঁচের উপরের কম্পমান বাতাসের মতন। পরিষ্কার খালি চোখেই ধরা দেয়। ওই ধরনের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটা বেশ বড়ো বড়ো ধানি জমি পেরোতে পেরোতে... অবশেষে দ্বিতীয় ভাগচাষি কালাহীরার বাড়িতে। চলার পথে সান্টু চারদিক দেখাতে দেখাতে ধারা বিবরণী দিতে থাকল..।

'আমরা যে জমিগুলোর উপর দিয়ে এখন চলেছি, সবই আমাদের। কালাহীরার বাড়ির আগ পর্যন্ত বনমালীকে আর ওর বাড়ির পর থেকে কালাহীরাকে। তবে ওধারে এতোট্যা জমি লাই বটে।'

চলার পথে কোনো জনবসতি নজরে পড়ল না। কেবল ধান জমি আর ধান জমি। জ্যৈষ্ঠ্য মাসের প্রচণ্ড গরমে মাঠ একেবারে ফুটিফাটা। চলতে গিয়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে পাশের গাঁয়ে এসে পৌঁছোলাম। মাঠের শেষপ্রান্তে একখানা মাটির বাড়ি। ওখান থেকেই শুরু অন্য আর এক গ্রাম। সান্টু জানাল ...

'এই গাঁয়ে আদিবাসী ও সাঁওতালদের আধিক্য বেশি।

নে, আর চিন্তা নেই, অবশেষে আমরা কালাহীরার বাড়িতে এসে পড়েছি।'

কালাহীরার বাড়িটা কোমর থেকে একটু বেশি উচ্চতার মাটির প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের মাথায় দু-চালা খড়ের ছাউনি। বর্ষায় মাটি যাতে ধুয়ে না যায় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা। প্রাচীর থেকে উঠান পুরোটাই গোবর মাটি প্রলেপে লেপা। ন্যেতার পোঁচ ছাপ তখনও বেশ স্পষ্ট। যেন সদ্য সদ্য লেপা হয়েছে।

আলকাতরা প্রলেপের খাটো উচ্চতার কাঠের প্রবেশ দ্বার। মন্দির গর্ভগৃহে প্রবেশের মতো মাথা নত করে অন্দরে প্রবেশ করতে হয়। বেশ বড়ো বড়ো একটা উঠান। উঠানের একপাশে কালচে রঙের একটা গোরু বাঁধা। অন্যপাশে ধানের গোলা। উঠোনে চরে বেড়াচ্ছে বেশ কয়েকটা বিভিন্ন বর্ণের দেশি মুরগি। মোরগ একটাই। প্রবেশ দ্বার থেকে প্রায় ফুট তিরিশেক দূরে বারান্দা সমেত এক কামরার মাটির ঘর। ঘরের এক পাশে টানা লম্বা ছাউনি। বাড়িটা অনেকটা ইংরেজি এল আকৃতির। সেখানে জ্বালানি কাঠ থেকে ঘুঁটে, বিচুলি, গোয়ালঘর, রান্না ঘর, কি নেই তাতে, প্রায় সবই আছে। পুরোটাই পুরোনো খড়ের ছাউনিতে আচ্ছাদিত।

সুঠাম সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক বছর পঁচিশেক সাঁওতাল আদিবাসী যুবক উঠানের একপাশে দড়ির খাটিয়ার উপর বসে। ওই কালাহীরা। সান্টুকে দেখেই অঝোরে কেঁদে উঠল। চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। কাঁদতে কাঁদতে ধরা গলায় বলল- 'সক্কাল থেকে হাঁড়ড়ি চড়েনি বাবু। ঘরে একটাও দানাপানি কিছু লাই বট্টে।'

সান্টু বলল- 'শোন্, তুর কোন্নো কথ্থাই আমি আর বিশ্বাস ...না, না, ব্যাপারটা এক্খন থাক। শোন্, তুই গত বচ্ছরেও এক্কট্টা ধানও দিস লাই, টাক্কাই দিস লাই বটে আবার এবছরও... ! কি ব্যাপ্পার বল্ তো ? তুই দিবিক কি না বল ?'

কাঁদো কাঁদো মুখে ধরা গলায়, কালাহীরা আকাশ পানে মুখটা তুলে... 'মাল্লিক এই বচ্ছরে এক্কদমই বারিষ হয় লাই বট্টে। জলের অভ্ভাবে সব ধান গাছ জ্বল্লে গেছ্ছে বাবু।'

মনে হল, ওই তীব্র দহনে, ফুটিফাটা ধরিত্রীও যেন নিজে থেকেই হৃদয় বিদারক গানটা ধরতে চাইছে...

'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই আল্লা মেঘ দে'

আরও বেশ কিছুক্ষণ ওদের দুই-জনের মধ্যে চলতে থাকল তর্কবির্তক। মিনিট দশেক অপেক্ষা। ক্ষণিকের জন্য এক অন্য জগতে বিচরণ করতে লাগলাম। ভাসা-ভাসা ওদের কিছু কিছু কথা কানে আসতে লাগল। আবার বেশিরভাগটা এলও না। শেষে সান্টুকে বলতে শুনলাম...

'তুই একটা কাম কর্, একটা মুরগি ধরে দে দেখি।'

মুহূর্তের মধ্যে কালাহীরা খাটিয়া থেকে নেমে পরনের মলিন খাটো ধুতিটা একেবারে হাঁটুর উপরে গুটিয়ে, ক্ষিপ্র গতিতে ধাওয়া করে একটা মুরগি ধরে দিল।

মুরগিগুলো একেবারে যেন হকচকিয়ে গেল। সব ক-টা মুরগি ও ওই মোরগটা মিলে উঠানের এক কোণে ভয়ার্তভাবে জড়ো হয়ে মালিকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। মনে হল, ওরাও যেন নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছে না... শেষে কিনা ওদের মালিকই... ?

বারান্দায় দাঁড়ানো সেই অর্ধনগ্ন যুবতীর নয়নযুগলও ওই মুরগির মতো ছলছল করে উঠল। দেখে বড়ো অসহায় লাগছিল। ওই হিংস্র রূপ দেখে সেও একেবারে ভয়ে জড়োসড়ো। শেষে মস্তক নত করে ঠায় ভুঁই এর পানে চেয়ে রইল।

একজনের লুব্ধ আঁখি যখন খুশিতে চকচক করে, ঠিক তখনই অপরের নয়ন, অশ্রু বাণেতে ভেসে যেতে চায়।

ওই করুণ দৃশ্য দেখে আমার ভিতরে এক চাপা বেদনা অনুভূত হতে লাগল। সে এক অসহায় করুণ অবস্থা। তবে সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে সংগ্রামী জীবনের সব কিছু হজম করা ছাড়া আমার আর কোনো ভূমিকা ছিল না। অবশেষে হেলতে-দুলতে জমিদার সুলভ ভঙ্গিতে, হাতে জীবন্ত মুরগির ঠ্যাং দুটোকে ঝুলন্ত বাঁদুরের মতো ঝুলিয়ে প্রথম ভাগচাষি বনমালীর বাড়ির উদ্দেশ্যে... সান্টুর পিছে আমি।

মনের তাড়নায় আবারও পিছে ফিরে তাকাতেই লক্ষ করলাম মেয়েটা অসহায় হয়ে আমাদের দিকে সজল নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। গাল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা। সেই বিষণ্ণভরা মুখমণ্ডল আজও কিছুতেই মনের গভীর থেকে আমি মুছে ফেলতে পারিনি।

(চন্দননগর, হুগলি)

সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল

তাপস চ্যাটার্জী

তখন কত বয়েস হবে আমার, এই আড়াই কিংবা তিন বছর। সারা বাড়িতে ছুটে বেড়াতাম। দাদা, বড়দি, ছোড়দি সব্বাই স্কুলে যেত, আমার স্কুলের বালাই ছিল না। বাবা তখন ছিলেন অসমে শিয়ালকাটি চা বাগানের মেডিক্যাল স্টোরকিপার। খুব সাধারণ পরিবার আমাদের, বলবার মতো বিশেষ কোনো ঘটনাই ছিল না তখন। কিন্তু সবার মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল। মা সারাদিন আমাদের চার-ভাইবোনকে সামলাতেই ক্লান্ত হয়ে যেত কিন্তু মুখে হাসি লেগে থাকত, আর বাবা কাজের থেকে ফিরে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে চা খেত আর বিশ্রাম করত। আমরা চার-ভাইবোন আর মা তখন চারদিকে বসে বাবার থেকে নানা রকম গল্প শুনতাম। জহরলাল নেহরু, বিদ্যাসাগর কখনও বা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এইসব। আমাদের কী যে ভালো লাগত বলে বোঝানো যাবে না। মনে হত সারা রাত শুনি। কিন্তু এরপর মায়ের কড়া আদেশ বই নিয়ে বসতে হবে। বাবা তো এরপর ক্লাবে চলে যেত আর মা সন্ধ্যা দিয়ে আমাদের নিয়ে পড়াতে বসে যেত। রাত ন-টার আগেই সবাই ঝিমুতে শুরু করত। তখন মায়ের অনেক কাজ, রান্না করা, সবাইকে খেতে বসানো, ঘুম পাড়ানো। আর আমার তো সহজে ঘুম আসত না, তাই আমাকে নিয়ে পিঠ চাপড়ে চাপড়ে সেই গান যেটা যুগ যুগ ধরে মায়েরা তাঁর সন্তানদের ঘুম পাড়ানোর জন্য করে... সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে। সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল ...

ঘুমপাড়ানি গান করতে করতে মা নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়ত, তারপর আমিও একসময় ঘুমিয়ে পড়তাম, তারপর মা কি করত জানি না, হয়ত অপেক্ষা - কখন বাবা আসবে, বাবাকে খাবার দিয়ে নিজে দুটি খাবে তারপর হবে ছুটি। আবার ভোরবেলা থেকে আরম্ভ পরের দিনের অমানুষিক পরিশ্রম। এই সমস্ত কথা তো আর তখনকার ভাবনা নয়, বড়ো হতে হতে এই বয়েসে এসে বুঝতে পারি যে মা তাঁর স্বামী-সন্তানদের একটু সুখে রাখবার জন্য কী চেষ্টাই না-করত। নিজের প্রাণের প্রদীপের মঙ্গল আলো দিয়ে আমাদের অন্ধকার রাত থেকে প্রভাতের দিকে নিয়ে এসেছে-সে তো আমার মা। তাই তো তাঁর স্মৃতিকে ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা আমার কেন কোনো সন্তানেরই নেই। আজ যখন এই ভাবনাটা মাথায় আসে, তখন বুঝতে পারি প্রত্যেক দিন মা এভাবেই পরিশ্রম করে যেত আর রাত্রিবেলা আবার আমার পিঠ চাপড়ে গান গাইত... সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে। সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল, অনেক বড়ো হয়ে যখন রাতে মার পাশে শুতাম না আর ঘুম আসত না। তখন থেকে আজও এই বয়েসে এসেও মনে হয় মা যদি এসে পিঠ চাপড়ে আবার গান করে বলে- সোনা ঘুমোল পাড়া জুড়োল, বর্গি এল দেশে।

আর মনে হয় সেই দিনগুলিতে মার সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লিষ্ট মুখটা। আমিতো কখনও মার গালে, গলায় ষাট ষাট করে বলিনি মা তুমি কষ্ট পেওনা, আমি আছি তোমার সঙ্গে। বড়ো হয়েও তো মাকে পরিবারের অন্য কারও চেয়ে আলাদা করে ভাবিনি, তখন তো আমি সবকিছু ভালোই বুঝতাম। মা মারা যাওয়ার সময় আমার চল্লিশ বছর বয়েস, তখনও তো মার কথা এভাবে মনে হয়নি, তবে এখন কেন বার বার মনে হয় সেসব কথা? আর একবার মনে এলে মাথা থেকে আর যেতে চায় না, আর মনে হয় ভগবান! এখন যদি আর একবার মাকে কাছে পেতাম...আবার কাছে পেলে কী করতাম জানি না তবে এই কথা বিলক্ষণ বুঝতে পারি যে আমার মার গলার সেই গান আর তাঁর পরিশ্রমে ক্লিষ্ট মুখখানা আমি এই জীবনে ভুলতে পারব না। আমি কখনও ভুলতে পারব না সেই ভোরবেলা উঠে মার ঘর ঝাঁট দেওয়া, উঠোন পরিষ্কার করা, বাসন মাজা থেকে সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। এমন বিরাট খোপা, বড়ো সিঁদুরের টিপ আর গভীর কালো চোখের মা আমার বিকেলবেলা সেজেগুজে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি, লাফদড়ি বা গোল্লাছুট খেলত, এসব কথা কি আর এই জীবনে কখনও ভুলতে পারব?

যাকগে যা হওয়ার নয় তা ভেবে এখন আর কী হবে। তবে মনে অজান্তেই কখন মনে এসে যায় সেই অসমের চা বাগানে বাবার কোয়ার্টার্স-এর কথা। সামনে বড়ো মাঠ, ভিতরের পরিষ্কার উঠোন আর ঝকঝকে ফুলের বাগানের কথা। গোলাপ, শিউলি, রজনিগন্ধা ফুলের

গন্ধে চারদিক ম ম করত। এসব সবকিছুই তো ছিল মার নিজের হাতে গড়া।

বছর দশেক আগে চাকরি সূত্রে ওই চা বাগানের কাছাকাছি তিনসুকিয়ার ট্রান্সফার পেয়ে গেলাম। তারপর প্রথম সুযোগেই চলে গেলাম সেই শিয়ালকাটি চা বাগানে। প্রায় ৫৮ বছর পর। আমাকে কেউই চিনতে পারেনি, চেনার কথাও নয়। গিয়ে দেখি প্রায় একই রকম রয়েছে, শুধু আগের মতো পরিষ্কার নেই, আগাছায় ভরে রয়েছে। বাড়ির পাশে একটা বিরাট বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, সেই গাছটা কেটে ফেলেছে বা ভেঙে গেছে, গাছের গুড়িটা এখনও আছে। কাছে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আর কত কি যে ভাবলাম তা আমি নিজেও জানি না। বাড়ির কাছে একটা পুরোনো গুদামঘর ছিল এখনও আছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখি একজন মোটাসোটা খুব বয়স্কা মহিলা বসে আছে। ভাবলাম গিয়ে একটু আলাপ করি। কাছে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে প্রথমে কোনো উত্তর দিল না। হেসে একটু পাশে গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় থাকে। বলল, 'উই কুলি লাইনে'। ওখানে পাড়া কে লাইন বলে, কুলি লাইন, বাবু লাইন এরকম। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম তোমার? 'আমি মহারানি আছি বাবু'।

নামটা শুনে আমার মন যেন ছটফট করে উঠল, সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই নামটা আমি বড়দি-ছোড়দির আর মার মুখে অনেকবার শুনেছি। এখন আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনে হয় আমাদের বাড়িতে কাজ করত। ওর একটা বোন ছিল শান্তিমণি, আমি জানতে চাইলাম শান্তিমণির কথা। ও বলল 'সব চলে গেল, হুই উপর চলে গেল!'

আমি তখন কী করব বুঝতে পারছি না, আকুল হয়ে বললাম অনেকদিন আগে আমরা ওই বাড়িতে থাকতাম, চ্যাটার্জীবাবু আমার বাবা, ইলা-শীলা আমার দিদি, স্বপন আমার দাদা আর আমি ছোটো ছেলে বলে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মহারানিও আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ছোটোবাবু ছোটোবাবু বলে বলে এমন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল যে আমিও চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। আর মহারানি ও কান্না ছাড়া আর কোনো কথা বলতে পারেনি। শুধু বলছিল 'হামাদের কোই নেহি বাবু, সব চলে গেল, উই উপর চলে গেল।' তারপর কতক্ষণ এভাবে চুপচাপ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম মনে নেই। আসার সময় হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে চলে এলাম। কী পেলাম জানি না। প্রথমে ভাবলাম একজন পরিচিত মানুষকে তো পেলাম, এটাই বা কম কি। কিন্তু পরে মনে হল সেই মাকে তো পেলাম না, বিনিময়ে পেলাম শুধু বুক ভরা হাহাকার আর পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস। ব্যস, এই আর কী। এরপরেও অনেকদিন অসমে ছিলাম। বারবার মনে হয়েছে আর একবারটি শিয়ালকাটি ঘুরে আসি, মহারানির বাবুয়ানি (বাবুর স্ত্রী) কেমন ছিল তা তো জানা হল না। প্রতিবারই নিজেকে দমন করেছি এই ভেবে যে ওখানে গেলে আবার সেই বুক ভরা হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাস, আবার মনের ওপর চাপ। তার চেয়ে মনে যে ছবি আঁকা আছে তাই নিয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই, এটাই বরং ভালো হবে। কী হবে আর পুরোনো স্মৃতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। আমার এসব স্মৃতির সঙ্গে কত মিল টেনিসন-এর লেখা কবিতার ক টা লাইন তাই তো কখনও ভুলতে পারি না...

'Time marches on but Memories stays
Torturing silently the rests of our days.'

(চন্দননগর, হুগলি)

অনাস্থা

সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

চৈত্রের আগমন হতে-না-হতেই অসহ্য গরমের দাপট শুরু হয়েছে। গরম শুকনো বাতাসের হলকা, সঙ্গে চাঁদি ফাটা রোদ, দুয়ের যুগলবন্দিতে প্রাণটা হাঁসফাস করছে। আর হবে নাই-বা কেন- লোকজনকে তো রুজি রোজগারের জন্য রাস্তায় বের হতে হবেই! এই গরমে সুপ্রতিমকেও রোজ রোজ অফিসে হাজিরা দিতে হচ্ছে। নিজের পাওনা ছুটি থেকে দু-চার দিন ছুটি নিয়ে যে একটু তরতাজা হবে সে সুযোগ নেই। আদালতের নির্দেশে ভিজিলেন্সের অফিসাররা কয়েকদিন ধরে অফিসে এসে তদন্ত চালাচ্ছে। কোর্টে মামলা হয়েছে অনেকেই নাকি কারচুপি করে চাকরি পেয়েছে। তাই এই তদন্ত। দু-চার বছর আগে যারা চাকরিতে যোগ দিয়েছে তাদেরকেই বেশি করে আতস কাচের তলায় রাখা হয়েছে। বড়ো সাহেবকে তলব করে এ সংক্রান্ত সব কাগজপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অনেক সাধ্যসাধনা করে পাওয়া চাকরিটা এবার বোধ হয়...।

ইতিমধ্যে সুপ্রতিমকে অফিসাররা বার কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। হাজার একটা প্রশ্ন করে জেরবার করে ছাড়ছে। এই অফিসে লোক নেওয়ার আগে সংবাদপত্রে কোনো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল কিনা? যদি দেওয়া হয় তা কবে কোন্ পত্রিকায় বের হয়েছিল? কবে পরীক্ষা হয়েছিল? সেই পরীক্ষায় সুপ্রতিম বসেছিল কিনা? পরীক্ষা দিলে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিল? পরীক্ষায় পাস করেছিল কি না? পাস করলে প্রাপ্ত নম্বর কত ছিল? অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট কী? এই চাকরিতে কারও সুপারিশ ছিল কি না? সুপারিশ করলে টাকাপয়সার কোনো লেনদেন হয়েছিল কি না? এরকম হরেক রকম উদ্ভট সব প্রশ্ন। যার তাৎক্ষণিক উত্তর দেওয়া বেশ শক্ত। প্রশ্ন অনেকে করতে পারে। সব প্রশ্নের উত্তর কি সবসময় সবাই দিতে পারে? এ কি গেরো রে বাবা।

হুগলি নদীর গা ঘেঁসে ছোটো শান্ত নিরিবিলি বনপলাশী গ্রাম। গাঁয়ের বেশিরভাগ মানুষের চাষবাস করে জীবন চলে। অভাবের চিহ্ন সারা গ্রাম জুড়ে।গ্রামের থেকে ছ-কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মফস্‌সল শহরে স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করেছে সুপ্রতিম। টানাটানির সংসারে বাবা-মা টিফিনের পয়সা দিতে পারত না। চেয়েচিন্তে পুরোনো বই জোগাড় করে চলেছে পড়াশোনা। সারাদিন শুকনো মুখে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরলে পেটের খিদে যেত মরে। সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন শরীরে পড়তে বসে চোখে নামত ঘুম। ঢুলু ঢুলু চোখে সুপ্রতিম খোলা বারান্দা থেকে উপভোগ করত বাঁশ বাগানের মাথায় জোনাকি পোকার মায়াবি আলোর খেলা, আর আকাশের মিটিমিটি তারাদের লুকোচুরি। স্বপ্নের আবেশে গভীর ঘুম আসত সাত তাড়াতাড়ি। এতে কী আর ঠিকঠাক পড়াশোনা হয়? হয়ওনি বেশিরভাগ বন্ধুদের। নরেন, সতীনাথ, বিকাশ, পঞ্চানন, কালীকৃষ্ণ একই অবস্থা ছিল প্রায় সকলের। স্কুলের কয়েক ক্লাসের গণ্ডি কোনোমতে পার হওয়ার পর অভাবের তাড়নায় বেশিরভাগই পড়াশোনায় ইতি টেনে দেয়। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। যে কোনোভাবে তাকে বশে আনতে যে হবেই। তাই বন্ধুরা নানা পেশায় যুক্ত হয়ে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই করে চলেছে। শুধু সুপ্রতিম কোনোমতে পড়াশোনা করে গেছে। দারুণ ভালো ছাত্র না-হলেও খুব খারাপ নয় সে।

পড়াশোনা শেষ করে সুপ্রতিম বেশ কয়েক বছর বেকার বসেছিল। কত পরীক্ষা যে দিয়েছে তার হিসেব নেই। কোনোটায় প্রিলিতে পাস হয়ত মেইন-এ ফেল। আবার কোনোটায় এ দুটোতে পাস হলেও ইন্টারভিউতে অকৃতকার্য। উত্তাল সমুদ্রে সে যেন দিশাহারা নাবিক। কুলের ঠিকানা কোথায়? নিরন্তর লেগে পড়ে থেকে শেষমেষ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বছর চার হল শিক্ষা দপ্তরের এই অফিসে চাকরি পেয়েছে। সুপ্রতিম স্বাধীনচেতা যুবক। কোনো কেষ্টবিষ্টু নেতার কাছে মাথা নোয়ানোর বান্দা সে নয়। নোয়ায়নি কোনোদিন। নিজের যোগ্যতায় সে সফল হয়েছে। কিন্তু আদালতের নির্দেশে দুর্নীতির তদন্তের স্বার্থে তাদের সময়কার চাকরি প্রাপকদের তত্ত্বতালাশ করা হচ্ছে। ঘোটালা কোথায় খুঁজে বের করার জন্য। আর এই উটকো আইনি ঝক্কি ঝামেলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে অন্যদের সঙ্গে সুপ্রতিমকেও।

ইদানিং সরকারি কর্মসংস্থানের বিষয়ে নানান সন্দেহ দানা বেঁধেছে। চারদিকে হুল্লোড়টা বেশ জমে উঠেছে। প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে বিভিন্ন বিভাগে কর্মী নিয়োগ নিয়ে। যোগ্য-অযোগ্য, বৈধ-অবৈধ, কারচুপি-স্বজন

পোষণ ইত্যাদি হরেক কিসিমের গল্পে বাজার সরগরম। কেউ কোনো অফিসে কাজ পেলে আড়ালে আবডালে কানাঘুসো চলছে ঠিক পথে পেয়েছে তো? কিংবা নিদেন পক্ষে এ যোগ্য তো? আর তা হবে নাই বা কেন? লোকে মিডিয়াতে চোখে যা দেখে কানে যা শোনে তা নিয়ে মন্তব্য করে। এর কোনো অন্তর্তদন্ত তারা করে না। তা করার প্রয়োজনও তাদের নেই। সব ক্ষেত্রে যে সবাই ভুলভাল পথে কাজ পাচ্ছে এ ধারণা অমূলক, অন্যায়। তা কে বোঝাবে, বুঝবেই বা কে? সুপ্রতিম মনে করে যা ডামাডোল শুরু হয়েছে এমন ভাবনা হতেই পারে। আর হবে নাই বা কেন। এত বিশাল দেশ মহাসাগরের ঢেউ এর-মতো আছড়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বেকার যুবক-যুবতীদের ঢেউ। চারদিকে সরকারি চাকরির জন্য হাহাকার। চাকরি কোথায়? সেই সন্ধান দেবেই বা কে? তাই যদি কোথাও কোনো ফাঁকফোকর পাওয়া যায় তার জন্য ফন্দিফিকির করা। আর এই সুযোগ নিয়েছে দাদালরা। এরাই মুশকিল আসান করে দেবে।

মহারাজ ইন্দ্রের রাজসভায় এনাদের জানাশোনা। বড়ো, মেজো, সেজো, এজেন্ট সবাই নাকি চেন সিস্টেমে কাজ করে। চাকরির গ্রেড অনুযায়ী রেট বাঁধা। অতএব ফেলো কড়ি মাখো তেল। মুখে মুখে গোপনে খবর ছড়ায় এসব এজেন্টদের কথা। শুনে, অনেকের চোখ কপালে। ওরা নাকি সাক্ষাৎ কর্মদাতা! স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণুর আধুনিক অবতার! মানুষের পেটের ভাতের সংস্থান করার আশ্চর্য ক্ষমতা ওদেরই হাতে। অভাগা বাবা-মায়েরা হতভাগা সন্তানদের দুধ-ভাতের সন্ধানে খোঁজপাত নিয়ে অতি গোপনে পৌঁছে যায় ওদের ঠিকানায়। সাগরেদরা তাড়া দেয় জলদি পয়সা ফেলুন, সিট সীমিত। তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে। ইন্দ্রের অনুচরদের দরবারে বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে অনেকেই হাজির। অপত্যস্নেহ বড়ো দুর্লভ জিনিস। ঘটি-বাটি যায় যাক! যদি বর্তে যাওয়া যায় এ যাত্রায়। ধরাধামের এই মানবজীবন হবে সার্থক। বাকি জীবনটা নিশ্চন্তে যাপন করা যাবে। সুখের সন্ধানে প্রভাবশালী- দের হাতের বোড়ে সমাজে কিলবিল করে ছড়িয়ে থাকা ছুটকোছাটকা নেতা, তাদের সাগরেদ আর কিছু আধিকারিকদের গোপন আঁতাতের চক্রব্যূহে ঢুকতেই হবে। তবেই তো সরস্বতীর কম আশীর্বাদ ধন্যদের জন্য সুপারিশ পত্র পৌঁছোবে যথাস্থানে। মনে হয়, সে বড়ো জটিল পথ। হয়ত এই পথে সিদ্ধিলাভ করে অনেকে আসন আলো করে বহু অফিস কাছারিতে বসে আছে। এই অভিযোগ তো নিন্দুকদের। তা নাও হতে পারে। সংবাদে তো কত কিছু বাজারে ছড়ায়। গোপন খবর আর গোপন নেই বললেই হবে না। প্রমাণ তো করতে হবে। তাই প্রমাণের আপ্রাণ চেষ্টা আর কী।

বঞ্চিতদের দল হাহুতাশ করে। ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আলোর ঠিকানা কোথায়? সাঁঝের শুকতারা, ভোরের ধ্রুবতারাকে সাক্ষী মানে। চাঁদ, সূর্যকে বলে যদি চিরসত্য হও, এই অন্যায়ের বিচার কোরো। শুরু হয় জোট বাঁধা। ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামে আইনি লড়াই-এ। সবশুনে উকিলের পরামর্শ আদালতে মামলা ঠুকতেই হবে। ওটাই ন্যায় বিচারের শেষ ঠিকানা। তিনি আশ্বাস দেন ‘কুছ পরোয়া নেহি, হাম হ্যায় না’। মামলা ওঠে কোর্টে। বাদী-বিবাদীর যুক্তির জালে বিস্তর শুনানি পর্বশেষে গুরুগম্ভীর সুরে হুজুরের আদেশ, ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়, বহুত গম্ভীর কেস, তুরন্ত তদন্ত হোনা চাহিয়ে’। অতএব গোয়েন্দা বিভাগকে জরুরি তলব। পাকড়াও করতে হবে বেটা ধান্দাবাজকে। আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমেছে গোয়েন্দারা। বমালসহ আসামিকে হাজির করতে হবে হুজুরের কাছে। সহসা তাই ইতিউতি আচমকা হানাদারি চলছে। খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো খানাতল্লাসি চলছে বিভিন্ন অফিসে। এ খোঁজার শেষই বা কোথায়? শেষমেশ ফল কী হবে? সে গোপন কথাটি হয়তো কেবল ব্রহ্মাই জানে।

সুধা সিন্ধু ঘোষাল বিচক্ষণ লোক বলে সমাজে সুখ্যাতি থাকলেও ও জনান্তিকে অনেকে ঘোড়েল বলে। একবার গাঁয়ের কাউকে কোনো বিষয়ে উপকার করলে তার কাছ থেকে তিনি তিনগুন কাজ আদায় করে ছাড়েন। স্ত্রী বিয়োগের পর এখন একটু মনমরা। একমাত্র কন্যা মনোরমার বিয়ে যে, তিনি যে সে পাত্রের সঙ্গে দেবেন না ঘটক মাত্রেই তা ভালো করে জানে। লেখাপড়ায় বিদূষী মেয়ে। তাই চোস্ত পাত্র চাই। এই এলাকায় নান্টু পাকড়াশির ঘটকালিতে বেশ নামডাক আছে। একদিন এসে বললেন, মনোরমার জন্য একজন খাসা পাত্তর পেয়েছি ঘোষালবাবু।

বলিস কী রে।

আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা। যে সে পাত্তর নয়, এক্কেবারে খাঁটি সরকারি চাকুরে। ভালো পোস্টে কাজ। বেতনও শুনেছি ভালোই পায়। তবে সাধারণ ঘরের ছেলে।

আরে তা হোক, সৎ ছেলে হলে হবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ নিপাট সৎ ছেলে। নেশাভাঙ কিছু করে না।

এরকম পাত্রই তো চাইরে নান্টু। তা পাত্রের নাম, ঠিকানা, কোথায় থাকে, অফিস কোথায়, ঠিকুজি কুষ্ঠি কী এনেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে যদি সম্বন্ধ হয় আমার দিকটা একটু ভেবে দেখবেন কিন্তু।

তা-তো দেখব। সে চিন্তা করিস না।

সুধাসিন্ধু, পাকড়াশির মুখের কথায় বিশ্বাস না-করে চুপি চুপি হানা দেয় সুপ্রতিম-এর অফিসে। বড় বাবুর কাছে আদ্যপান্ত সব খবরাখবর জেনে মনে মনে তিনি বেশ খুশিই হলেন। মেয়েকে সুপাত্রের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ভবসাগর পার হবে এটাই ঘোষালের আশা। এবার পাত্রকে কবজা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। নান্টু ঘটকের কাছ থেকে মনোরমার ছবি, বংশ পরিচয়, পড়াশোনাসহ সমস্ত বায়োডাটা পেয়েছে সুপ্রতিম। বাড়িতে মা-বাবাসহ সকলে ছবি দেখে মনোরমাকে পছন্দ করেছে। এরপর নান্টুর পরিচালনায় দু-পক্ষের দেখাশোনা, কথাবার্তা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গেল। শুধু বিয়ের দিনক্ষণটা নিয়ে একটু টাল বাহানা চলছে। পরিচয়ের পর সুপ্রতিম আর মনোরমার ফোনালাপ ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠেছে এই ক-মাসের মধ্যে। মাখো মাখো ভাব না-হলেও রোজ কত কথা হয়। বাকি রয়ে যায় তবু কত কথা!

জীবনের এরকম সন্ধিক্ষণে বেমক্কা চাকরি সংক্রান্ত এরকম ঝামেলায় পড়তে হবে সুপ্রতিম স্বপ্নেও ভাবেনি। আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতো চাকরি দুর্নীতির কথা মনোরমার কানে এসেছে। হবু স্বামী চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে না তো! অজানা এই আশঙ্কায় একটু চিন্তায় পড়ে গেল।

তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো?

সুপ্রতিম বলল আরে নানা। যারা চিটিং করেছে তাদের বিপদ আছে। আমাদের কোনো ভয় নেই।

তাই যেন হয়। বলল মনোরমা।

সরকারি চাকরি সহজে যেমন আসে না তেমনি সহজে যায়ও না ম্যাডাম।

সে তো জানি। কিন্তু আদালতের প্যাঁচপয়জারে যদি কোনো গরমিল ধরা পড়ে, আর ওই সময়ের চাকরি নিয়োগ প্রক্রিয়া সব যদি বাতিল হয় তখন কি অনর্থ হবে বুঝতে পারছ?

আমি তো আর সে সব বলতে পারব না। তবে চাকরি গেলে আমি কি আর অন্য কাজ করতে পারব না? বলল সুপ্রতিম।

তা পারবে না কেন।

তবে এক কথা নিয়ে সবসময় ঘ্যান ঘ্যান কর কেন? তুমি মনে হয় আমাকে পছন্দ করোনি। করেছ আমার চাকরিকে।

শোনো কথা। তা কেন হবে?

আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে?

মনোরমা বলল- নানা ও সব নয়। আসলে আমাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন তোমার বিষয়ে সবাই জেনে গেছে। কিন্তু হঠাৎ যদি শোনে তোমার কোনো চাকরি নেই। তাহলে সবাই কী ভাববে বুঝতে পারছ। মানসম্মান আর থাকবে না।

ও! তাই বুঝি বার বার....

কেন তুমি রাগ করো এতে?

রাগ না-হলেও বিরক্তি ও অস্বস্তি হয়তো বটেই।

এদিকে অন্য একটা কেলো হয়েছে। সুপ্রতিমের বড়ো মামা বীরেশ্বর রায়। বীর না-হয়েও এলাকার বীর বলে বর্তমানে নাম-ডাক হয়েছে। দালালিতে হাত পাকিয়ে ইদানিং ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ঠাটেবাটে চাকচিক্য বেড়েছে। বীরেশ্বরের দাপটে বাঘে-গোরুতে একই পুকুরে জল খেতে বাধ্য হচ্ছে। চারদিকে রটে গেছে তিনি ব্যাপক দুর্নীতি ও পাচার চক্রে জড়িত। আয়ের সঙ্গে সংগতি বিহীন প্রচুর অর্থের মালিক তিনি। গোয়েন্দারা তাকেও তলব করেছে। এই সূত্র ধরে গোয়েন্দাদের ধারণা মামার সুপারিশে ভাগনে সুপ্রতিমের হিল্লে হয়েছে। কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায় কে জানে! এ সংবাদ বাজারে ভাইরাল হতেই চেনা-অচেনা সবাই কেত্তন গাইতে শুরু করল- সুপ্রতিম এ বাজারে এমনি এমনি চাকরি পেয়ে গেল? কী আর এমন ভালো ছেলে? ওই শ্যামল, বিমল, পূর্ণিমা, শুভমিতারা পড়াশোনাতে কত ভালো, ওরা তো পেল না। নিশ্চই কোনো ঘাপলা আছে। মামার এত জানাশোনা, ওপর

মহলে ওঠা-বসা যখন ভাগনে তো আর বসে থাকবে না। এরকম বাঁকা কথা আর রসালো গল্পে সুপ্রতিমকে নিয়ত বিদ্ধ হতে হচ্ছে।

অফিসে বড়ো কর্তাও প্রথম থেকে একটু বিগড়ে আছেন। তাঁর সন্দেহ নতুন কর্মীরাও বৈধ পথে আসেনি। কোনো অতি উৎসাহী কলিগরাও দুর্নীতি নিয়ে হাসি মশকরার ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। ঘরে-বাইরে অযাচিত এক বিদিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি তৈরি হল। এই অসহনীয় পরিস্থিতির কথা সুপ্রতিম কাউকে ব্যক্ত করতে পারছে না। তার কষ্ট-যন্ত্রণার আঁচ কেউ পাচ্ছে না। কারও তা পাওয়ার কথাও নয়। অনাকাঙ্খিত সন্দেহের এই বাতাবরণে দিনদিন মানসিক চাপ বাড়তে লাগল। ফল হল মারাত্মক। অফিসের কাজে মন বসছে না। নিয়মিত ভুল হচ্ছে কাজে। সম্প্রতি অফিসের অডিটে হিসেবে গরমিল ধরা পড়েছে। সুপ্রতিম কিছুতেই সেই হিসাবের মিল দেখাতে পারেনি। এই নিয়ে বড়ো সাহেবের সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকমের ঝামেলা হয়েছে। সুপ্রতিমও ছেড়ে কথা বলেনি। অবাঞ্ছিত এই ঝামেলা করে সার্ভিস রুল ভাঙার দায়ে সাময়িকভাবে সুপ্রমিতকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কর্তব্যে অবহেলা ও অযোগ্যতার অভিযোগে শুরু হয়েছে বিভাগীয় তদন্ত।

লাও ঠেলা- গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো আরও বিপদ এসে হাজির হল। আনন্দের চাকরি বিষাদের কারণ হয়ে উঠেছে। কোথা থেকে কী হল? কেনই বা হল? তার ঘটে কিছু ঢুকছে না। অতিরিক্ত চিন্তাভাবনাতে রাতের ঘুম ছুটল। বাড়ল শারিরীক বৈকল্য। সীমাহীন মানসিক অবসাদে পড়ল সুপ্রতিম।

সুধাসিন্ধুর নেটওয়ার্কে ধরা পড়ল হবু জামাই-এর এই টানাপোড়েনের সংবাদ। তিনি নিজেই খোঁজ নিয়ে একটু হতাশই হলেন। সুপ্রতিম যে একটা সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়েছে বুঝতে আর বাকি রইল না। যাক মেয়ের বিয়েটা এখনও হয়নি এটাই বাঁচোয়া। মনে মনে স্থির করলেন জেনেশুনে এরকম একজন পাত্রর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। মনোরমাকেও কড়া নির্দেশ দিলেন সুপ্রতিমের সঙ্গে যেন কোনো ধরনের যোগাযোগ না-রাখে।

মনোরমা বলল-বাবা, অফিসে এসব ঝামেলা গোলমাল হতেই পারে। তাই বলে তুমি এই অবস্থায় ওর পাস থেকে সরে যাবে। এটা কিন্তু ঠিক করছ না।

হ্যাঁ তাই যেতে হবে। এসব ফালতু ঝামেলায় থেকে লাভ নেই।

কিন্তু আমাদের সম্বন্ধটাতো সবকিছু পাকাপাকি হয়ে গেছে। ওরা আমাদের আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে।

না-আইনত এখনও ওরা আমাদের আত্মীয় হয়নি।

আমি যে এতদিন ধরে সুপ্রতিমের সঙ্গে বিয়ে নিয়ে কত কথা বললাম।

সে হতেই পারে। যা হয়ে গেছে তা বাদ দাও। এখন পরিস্থিতি আলাদা। এখন থেকে আর কথা বলো না।

জলভরা চোখে মনোরমা বলে-বাবা আমি সাবালক, এভাবে কাউকে আমি ঠকাতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করো।

একটু বিরক্ত হয়ে সুধাসিন্ধু বলল- বেশি কথা বোলো না। আমরা কাউকে ঠকাইনি। আমি তো আমার ভালোটাই বুঝব। তাছাড়া একজন মা মরা মেয়েকে আমি কত কষ্টে মানুষ করেছি। বুকে আগলে রেখেছি। তাকে কিছুতেই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি ঠেলে দিতে পারি না। এইরকম পাত্রের উপর আমি যে 'আস্থা' রাখতে পারছি না মনোরমা।

বাবা আমি যে মনে মনে সুপ্রতিমকে খুব ভালোবেসে... ওকে আমি ভুলতে পারব না। তুমি জোর কোরো না। যত কষ্ট হোক আমি ওর পাশে থাকব। দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।

মনোরমার এ কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন সুধাসিন্ধু। আর-একটা কথা বলবে না এ বিষয়ে, বলে ধমক দিলেন। শেষ কথা আমি তোমায় বলে দিয়েছি। এরপরও যদি মনোরমা সুপ্রতিমের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখে তাহলে তিনি দেশান্তরি হবেন। একথা মেয়েকে সাফ জানিয়ে দিলেন সুধাসিন্ধু।

কতদিন হয়ে গেল সুপ্রতিম, মনোরমার কোনো ফোন পায়নি। অথচ রোজ কতবার যে-সে ফোন করেছে মেসেজ করেছে তার ঠিক নেই। এতেই মর্মাঘাতে সুপ্রতিম আরও ভেঙে পড়েছে। মনোরমা তার সঙ্গে কেন এমন ব্যবহার করছে সে বুঝতে পারছে না। তার বোঝার কথাও নয়। বারবার ভেবেছে বাড়িতে গিয়ে মনোরমার সঙ্গে দেখা করবে। সাহস হয়নি। সুধাসিন্ধু বাবু প্রথমদিকে দু-একবার ফোন করলেও বহুদিন হল তিনিও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। সুদিনে সবাই

থাকে দুর্দিনে পাশে কেউ থাকে না। এই সত্যটি সুপ্রতিম হাড়ে হাড়ে টের পেল। অবশেষে একদিন পাকড়াশির কাছে সরাসরি গিয়ে জানতে পারল মনোরমার অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র বেহালার নামকরা বড় সোনা দোকানের মালিকের একমাত্র সন্তান।

সুপ্রতিম হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল- নান্টুদা সত্যিই মনোরমার বিয়ে!

হ্যাঁ। তোমাকে মিথ্যা বলে লাভ কী?

কিন্তু মনোরমা তো এ বিষয়ে কোনোদিন কিছু বলেনি।

পাকড়াশি মৃদু হেসে বলল- দূর পাগল! মেয়েরা এসব কথা মুখ ফুটে কাউকে কখনো বলে নাকি। সবতো শুনলে-তো আর বেশি জানার দরকার নেই। তুমি আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো না। তুমি অন্য কিছু ভাবো।

এসব শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সুপ্রতিম। মনোরমাকে নিয়ে যে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে ছিল নিমেষে বিলীন হয়ে গেল। এই স্বল্প সময়ে মনোরমাকে বড়ো ভালোবেসে ফেলেছিল। নিদারুণ বিরহ বেদনায় বিদ্ধ হতে লাগল অন্তর। মানসিক যন্ত্রণায় মনে মনে ভাবল- যখন চাকরি পায়নি সে সময় অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে বিয়ের কথা মনেই আনেনি। আর এখন সে চাকরি করে অথচ তা থাকবে না বাতিল হয়ে যাবে এটা ভেবে কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙেও দিল। এককালে সমাজে যে চাকুরে পাত্রের জন্য সবাই মাথা খুঁড়ে মরত বর্তমানে তাদের ওপর আর চোখ বুজিয়ে ভরসা রাখতে পারছেন না। এতটাই অনাস্থা তৈরি হয়ছে তাদের প্রতি। হায়রে কপাল! কি দিনকাল এসে গেল। কেন এই পরিস্থিতি হল? কারা এরজন্য দায়ী? সুপ্রতিম অবশ্য মনে করে নিয়ম মেনে পাওয়া তার চাকরি যদিও ক্ষতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবুও পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিয়ের বাজারে সেও ব্রাত্য। এমন বেইজ্জতি হতে হবে জীবনে কখনও কল্পনায় আনেনি সুপ্রতিম। বাড়ির লোকের কাছে জানা গেল অবসাদগ্রস্ত হয়ে কয়েকদিন গৃহবন্দি ছিল। বাবা মা অনেক সান্ত্বনা দিয়েছে। ভালো কোনো পাত্রী দেখে নতুন সম্বন্ধের আশ্বাসও দিয়েছেন। আবেগপ্রবণ সুপ্রতিম সে সব আর কোনো কিছুতে আগ্রহ দেখায়নি। ছন্নছাড়া বেশে উদাসী সুপ্রতিমকে গঙ্গার ঘাটে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এরপর হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তার আর কোনো খোঁজ নেই। তাকে খোঁজবার একান্ত আপনজনও যে এ জগতে হয়ত কেউ নেই!

(বেহালা কলকাতা)

গঙ্গোত্রীর পথে
প্রসেনজিৎ মিত্র

প্রায় ১১ ঘণ্টা দেরি করে উপাসনা এক্সপ্রেস যখন হরিদ্বার পৌঁছোল তখন ঘড়ির কাঁটা রাত ৩টে ছুঁই ছুঁই। স্টেশন থেকে বেরোতেই ঠান্ডা হিমেল হাওয়া স্বাগতম জানাল। ঠান্ডার বিদায়বেলার রেশটুকু এই রাতের দিকেই টের পাওয়া যায়। শীতের পোশাক গায়ে চড়িয়ে নিলাম। এরপর একটা অটো নিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে কয়েক মিনিট যেতেই ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ট্রেনের গতিবিধিটা আগে থাকতে জানানোর ফলেই দারোয়ান গেট খুলে ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরই উঠে পড়তে হল। পরিকল্পনা অনুযায়ী আজই বেরিয়ে পড়ব গঙ্গোত্রীর পথে। সেই অনুযায়ী এজেন্ট সনাতনের সংগে যোগাযোগ করে ঘরের ও গাড়ির কথা বলে রেখেছিলাম। সাড়ে ৮ টায় স্নানপর্ব সেরে লটবহর নিয়ে বাইরে আসতে দেখি সনাতন গাড়ি নিয়ে হাজির। সুইফ্‌ট ডিজায়ার-এর চালকের আসনে বসে রাজু একগাল হেসে নমস্কার জানায়। আগামী ক-দিন ওর গাড়িতেই ঘুরে বেড়াব। চটপট মালপত্র তুলে রাজু গাড়ি স্টার্ট দিল। হাত নেড়ে সনাতনকে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলাম।

সুন্দর নীল আকাশ, মিষ্টি রোদ, আশেপাশের ছোটো ছোটো পাহাড় হরিদ্বারকে এক মায়াবী রূপে সাজিয়ে তুলেছে। হিমালয়ের টানে তাইতো বারে বারে ছুটে আসা এই হরিদ্বারে। এখান থেকে নানান পথ চলে গেছে দেবত্মা হিমালয়ের নানান দিকে। প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে এ এক অমোঘ টান যা উপেক্ষা করা খুবই দুষ্কর। গাড়ি গঙ্গার উপর ওম ব্রিজ পেরিয়ে বাইপাস ধরে চলল ঋষিকেশের দিকে। বাঁদিকে গঙ্গাকে রেখে পেরিয়ে চলেছি বিড়লা ঘাট, বিষ্ণু ঘাট, হর-কি-পৌড়ি ঘাট। এগুলো সবই নদীর ওপারে। গাড়ির গতি বাড়ল। ডানহাতে রাজাজি আর বাঁদিকে মতিচুর জঙ্গলের বুক চিরে চওড়া মসৃন রাস্তা পথের শোভা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। সামনে হিমালয়ের হাতছানি। ঋষিকেশ পেরিয়ে মুনি-কি-রেতির রাস্তা ডাইনে রেখে গাড়ি বাঁদিক পাহাড়ি রাস্তা ধরল। এক-একটি পাহাড়ি বাঁকে উঠতে উঠতে দেখা যায় নীচের ফেলে আসা সমতল, ঋষিকেশ, হরিদ্বার। সামনের ফলক জানান দিচ্ছে চাম্বা ৫৫ কিমি। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ শহর এই চাম্বা। এখান থেকে একটি পথ বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে চলে গেছে ধানোয়ালটি হয়ে মুসৌরি, আর পূর্বদিকে ডানহাতি পথে টিহরী ড্যাম। চাম্বা শহরের কিছু আগে গাড়ি বাঁদিকের বাইপাস ধরে একটি সুদৃশ্য টানেলের মধ্য দিয়ে শহরকে পাশ কাটিয়ে উত্তরমুখী পথ ধরল। শিবালিক হিমালয় পেরিয়ে আমরা মধ্য হিমালয়ের পথে। দূরে বরফাবৃত শৃঙ্গরাজি নিয়ে হিমাদ্রি হিমালয়ের হাতছানি। যে হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি হিমালয় প্রেমিক ব্রিটিশ, ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যান্ড। তিনি জর্জ ম্যালরিকে নিয়ে এভারেস্ট-এ ওঠার প্রাথমিক পরিকল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিখ্যাত ভ্রমণ সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বারে বারে ছুটে এসেছেন হিমালয়ের টানে। সে সময়কার হিমালয় ভ্রমণ ছিল অনেক বেশি কঠিন ও বিপদসংকুল। আজ যেখানে গাড়ির পথ, সেই পথই তাদের হেঁটে পাড়ি দিতে হত। হঠাৎ গাড়ির ঝাঁকুনিতে বাস্তবে ফিরে আসি। সামনে নতুন ব্রিজ তৈরি হচ্ছে তাই রাস্তা খারাপ। গাড়ি খানিক যেতেই দেখা পেলাম মা গঙ্গার। অনেকটা দূরে স্থির গতি। হ্যাঁ, ওটাই টিহরী ড্যাম। সামনে এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে দূরের নদী কাছে আসতে লাগল। নদীর উপত্যকা এখানে বেশ চওড়া। দু-পাশের পাহাড়ে কৃষিকাজ হচ্ছে তাই সবুজের সমারোহ। মৃত্তিকা ক্ষয় রুখতে ও জীবিকার কারণে পর্বতগাত্রে এই ধাপচাষ। স্থানীয় চাহিদা মেটাতে এই চাষ খুবই উপযোগী। আশপাশ দিয়ে সরু ফিতের মতো পাহাড়ি রাস্তা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ছোটো ছোটো গ্রামগুলোতে চলে গেছে। চিনিয়ালসোর-এর উপর দিয়ে যাচ্ছি। এখানে রাস্তার দু-পাশে অনেকটা সমতলভূমি, তারপর গঙ্গা। এখানে রাস্তার দু-পাশে বেশকিছু হোটেল ও দোকানপাট রয়েছে। এরপর যাত্রাপথে সামান্য বিরতি। ধরাসু এসে গেছি। এখানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনপর্ব সেরে নিলাম। ধরাসু ছোট্ট জনপদ। পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে গেছে। এখান থেকে বাঁহাতি রাস্তা চলে গেছে শ্রীকোট, বারকোট হয়ে যমুনোত্রী। আর আমাদের গাড়ি চলল সোজা পথে উত্তর কাশী। ধরাসুর পর থেকে উপত্যকার বিস্তার ধীরে ধীরে কমতে লাগল। উলটোদিকের পাহাড়গুলি এখন অনেক কাছে। নীচে প্রবাহমান গঙ্গা। রাস্তার অবস্থাও খুব ভালো নয়। কিন্তু প্রকৃতির অনিন্দ্য সৌন্দর্যে সেটুকু ঢাকা পড়ে যায়। ধরাসু থেকে প্রায় ৩২ কিমি পথ পেরিয়ে

পৌঁছোলাম উত্তর কাশী।

নদীর দুই পারে শহর গড়ে উঠেছে। শেষ দুপুরের রোদ এসে পড়েছে তিন দিকের পাহাড়গুলোতে। উত্তর কাশী জেলার সদর শহর হল এই উত্তর কাশী। মাঝখানে-গঙ্গার উপরে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে জলাধার, আর তাতে খেলে বেড়াচ্ছে ছোটো ছোটো স্পিডবোট। নদীর উপর ভাগীরথী সেতু দুই পাড়ের সংযোগ রক্ষা করেছে। উত্তরাখণ্ডের কাশী হল এই উত্তর কাশী। রয়েছে কাশীর মতো বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির। এছাড়া উত্তর কাশীর আরেকটি প্রধান আকর্ষণ হল নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট। উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী মূল রাস্তা থেকে নদীর দিকে নেমে সেতু পেরিয়ে চড়াই পথে ৫ কিমি দূরে এই ইনস্টিটিউট। শহর পেরিয়ে ঘন পাইনের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়েছে পথ। পাইনের ফাঁকে ফাঁকে নীচের উত্তর কাশী শহরের দৃশ্য অপূর্ব। পথের শেষ হয়েছে ইন্সটিটিউট এর গেটে। গেট পেরিয়ে বাঁদিকে গাড়ি পার্কিং এর জায়গা। চওড়া পিচঢালা পথ এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। পথের দু-পাশে লম্বা লম্বা পাইন, দেবদারু সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আশে। আলোছায়া পথে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে। গাছপালার মাঝে মাঝে রয়েছে কলেজ, লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, হোস্টেল এবং ক্যান্টিন। চারদিকে সবুজ পাহাড়ের কোলে জায়গাটি সত্যিই খুব সুন্দর।

পরদিন ভোর ভোর প্রাতঃরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম। আজকের গন্তব্য হরশীল। উত্তর কাশী শহর পেরিয়ে গাড়ি চড়াই পথ ধরল। আকাশ আজ মেঘলা। পথের ডানদিকে গঙ্গাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলা। উলটোদিকের পাহাড়ে সবুজ কৃষিক্ষেত্র। যত এগোচ্ছি ততই পালটে যাচ্ছে দৃশ্যপট। প্রকৃতি উজাড় করে মেলে ধরছে নিজেকে। পৌঁছোলাম মানেরী। এখানেও গঙ্গার উপর বাঁধ দিয়ে ড্যাম তৈরি করা হয়েছে। ছোট্ট এই জনপদে গড়ে উঠেছে হোটেল, দোকানপাট। আরও এগোতে শুরু হল হালকা বৃষ্টি। বৃষ্টি আর মেঘের খেলায় মায়াবী পথে চলতে চলতে পেরিয়ে এলাম ভাটোয়ারী। গাড়ি আরও চড়াই পথে উঠতে নীচের উপত্যকা ছবির মতো দেখতে লাগছে। অনেক নীচে গঙ্গাকে শীর্ণ স্রোতস্বিনীর মতো লাগছে। আশপাশ থেকে ছোটো ছোটো জলধারা এসে মিশেছে গঙ্গাতে। জলপ্রবাহের এই মিলনক্ষেত্র বর্ণনাতীত, যা আমাদের পথ চলাতে বার বার ছেদ টানছিল। অপার, অকৃত্রিম এই প্রকৃতিকে ক্যামেরাবন্দি করা যায় না। তবুও এই ছবিটুকুই স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। দু-পাশের বরফাবৃত পাহাড় চূড়োগুলি যেন হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। এরপর কিছুটা উৎরাই পথে নেমে এসে সেতু পেরিয়ে বাঁদিকে গঙ্গাকে নিয়ে চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছোলাম গাংনানি। এই জায়গা বিখ্যাত তার উষ্ণ-প্রস্রবণের জন্য। এখানে গঙ্গার বিস্তার অনেক চওড়া। দু-পাশে বিশাল সাদা চড়ার মধ্য দিয়ে সর্পিলাকার পথে বয়ে চলেছে নদী। চারদিকে এক অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। এ রাস্তায় গাড়িঘোড়াও বেশ কম। একটানা ঝিঁঝি পোকার ডাক। আশেপাশের জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে কিছু পাখির ডাক। পাহাড়, অরণ্য, নদী যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এরপর গাড়ি উৎরাই পথে নামতে লাগল, সামনেই নীচে দেখা যাচ্ছে হরশীল উপত্যকা। মূল রাস্তা থেকে বাঁহাতি জঙ্গলের পথ ধরলাম। বাঁদিকে পর পর সেনাদের ছাউনি, তাতে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও চোখে পড়ল। আর ডানদিকে গাছপালার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গঙ্গাকে। খানিক যেতেই নদীর উপর লোহার পুল পেরিয়ে পৌঁছোলাম হরশীল গ্রামে। পুল পেরিয়ে ডানদিকে PNB-র শাখা। পাথর বাঁধানো পথ চলে গেছে সামনে গ্রামের ভিতরে। আর বাঁদিকে হোটেল হিলটপ। আমাদের হরশীলে সাময়িক আস্তানা। এখানেই থেকে ঘুরে দেখব হরশীলকে। হোটেলের নীচেই এদের রেস্টুরেন্ট। দোতলায় থাকার ব্যবস্থা। দোতলায় রয়েছে টানা লম্বা বারান্দা। এখান থেকে নদী না দেখা গেলেও চারপাশটা পাহাড়ে ঘেরা। পাহাড়গুলো সবুজের চাদরে মোড়া। আর যেগুলোর উচ্চতা বেশি সেগুলোর মাথা বরফে মোড়া। এখানে চেয়ারে বসেই সেই সৌন্দর্য উপভোগ করে সময় কেটে যায়।

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম হরশীল গ্রাম দেখতে। হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকের গলিপথ ধরলাম। পাথর বাঁধানো পথের দুপাশে ছোটো ছোটো বাড়ি। বাড়ি লাগোয়া আপেল গাছের সারি। হরশীল বিখ্যাত তার আপেলের জন্য। জনশ্রুতি ফ্রেডরিক উইলসন নামের জনৈক ব্রিটিশ কাঠ ব্যবসায়ী স্থানীয় একটি মেয়েকে ভালোবেসে পাকাপাকিভাবে এই হরশীলেই থেকে গেছিলেন। তিনিই এখানে আপেল বাগান করেন। তারপর থেকে আপেল চাষ-ই এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে।

এখানকার আপেল ভারত বিখ্যাত। নভেম্বরে এখানে আপেল উৎসব হয়। পায়ে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম একটি পোস্ট অফিস। বিখ্যাত সিনেমা 'রাম তেরি গঙ্গা মৈলিতে' এই পোস্ট অফিসকেই দেখানো হয়েছিল। এরপর খানিক এগোতেই GMVN এর ট্যুরিস্ট লজ। হোটেলের পিছন দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা নদীর পারে পৌঁছে গেলাম। সুন্দর একটি বসার জায়গাও আছে। নদী এখানে সোজা এসে একটা চওড়া বাঁক নিয়েছে। দূরে বরফাবৃত শৃঙ্গ। নদীর উলটোদিকে ঘন পাইন, বার্চ, দেওদারের জঙ্গল। যেন শিল্পীর হাতে আঁকা ছবি। কান পাতলে পাখিদের কিচিরমিচির সবসময়ের সঙ্গী। অনেকটা সময় কেটে যায় এই সুন্দরের মাঝে। চাইলে নদীতে পা ভেজানো যায়। সামনে নদীর বিরাট চড়া। বেশ কিছুক্ষণ এখানে কাটিয়ে হোটেলের সামনে ফিরে ডানহাতি রাস্তা ধরলাম। হরশীলের এটি বাজার এলাকা। হাতে গোনা কয়েকটি হোটেল, খাবার আর সবজির দোকান। দু-একটা শীত পোশাকের দোকানও রয়েছে। স্থানীয়দের হাতে তৈরি শীত পোশাক এখানে পাওয়া যায়। এখান থেকে একটু এগিয়ে ডানহাতি রাস্তা সেনা ছাউনির পাশ দিয়ে চলে গেছে মুখবা গ্রাম। আর বাঁহাতি পথে ছোট্ট পুল পেরিয়ে চললাম বাগোরি গ্রামের দিকে। প্রধানত ভুটিয়াদের বাস এই গ্রামে। এই গ্রাম ভারত সরকারের 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে প্রথম গঙ্গা ভিলেজ এর স্বীকৃতি পেয়েছে। রাস্তার দু-পাশে আপেল বাগান। তবে এখন আপেলের সময় নয়। আর গাছগুলির পাতাও ঝরে গেছে। গ্রামের বাঁদিক দিয়ে বয়ে চলেছে প্রাণোচ্ছল গঙ্গা, দু-পাশে সুউচ্চ পাহাড়ের সারি। বেশ নিরিবিলি আর শান্ত এই গ্রাম। এখানেও কতকগুলি থাকার জায়গা রয়েছে। বাগোরি গ্রাম দেখে এবার গন্তব্য মুখবা। সেনা ছাউনির পাশ কাটিয়ে গাড়ি চড়াই পথ ধরল। সরু পথে গঙ্গাকে ডাইনে রেখে এগিয়ে চললাম। এদিকটায় গাছপালা বেশ কম। অনেকটা নীচে হরশীল উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারে গঙ্গোত্রী যাওয়ার রাস্তা। সেই রাস্তার পাশে ধারালি গ্রামও সুন্দর দৃশ্যমান এখান থেকে। সবকিছু যেন ছবির মতো। প্রায় ৫ কিমি পথ পেরিয়ে গাড়ি থামল। পথের পাশেই ছোট্ট গ্রাম মুখবা। রাস্তা থেকে কয়েক ধাপ খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দির চত্বরে। খুব জোর হাওয়া দিচ্ছে। দু-একটি পূজা সামগ্রীর দোকান। সামনে সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি গঙ্গা মায়ের মন্দির। মন্দিরের আশেপাশে কিছু কাঠের ও পাথরের বাড়ি নিয়ে এই গ্রাম। মন্দির চত্বর থেকে চারপাশের পাহাড়, নদী, সবুজে ছাওয়া উপত্যকা সত্যিই মনোমুগ্ধকর। গঙ্গোত্রী মন্দিরের গঙ্গা মূর্তি এখন এই মন্দিরে রয়েছে। কালী পুজোর পর এখানে নিয়ে আসা হয়, আবার অক্ষয় তৃতীয়ার শোভাযাত্রা করে মাকে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গোত্রী। সেই শোভাযাত্রায় স্থানীয় মানুষের ঢল নামে। এরপর মায়ের মূর্তি দর্শন করে ফিরে চললাম হরশীলে। আকাশে মেঘ রোদের খেলা চলছে। ঠান্ডার প্রকোপও বাড়ছে। বিকেল পেরোতেই ঝুপ করে অন্ধকার নামল সারা উপত্যকা জুড়ে।

পরদিন খুব ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গোত্রীর পথে। কিছুটা যেতেই গতকালের দেখা ধারালি গ্রাম। উলটোদিকে মুখবার রাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখানেও প্রচুর আপেল গাছ। চওড়া নদীর পাশে তৈরি হয়েছে হেলিপ্যাড। পথের ধারে পাইন, দেবদারু ও অন্যান্য পাহাড়ি গাছের উপস্থিতি পথকে করেছে আরও আকর্ষণীয়। এরপর চড়াই পথে পৌঁছোলাম লঙ্কা। এখানে সেতু পেরিয়ে এলাম। সেতু থেকে অনেকটা নীচে নদী এখানে। ভয়ংকর গিরিখাতের মধ্যে দিয় সাদা সুতোর মতো বয়ে চলেছে গঙ্গা। এরপর খানিকটা যেতে এল ভৈরবঘাটি। চারদিকে গঙ্গা উপত্যকার নয়নাভিরাম দৃশ্য। এরপর আরও ৬ কিমি পথ পেরিয়ে এল গঙ্গোত্রী। পার্কিংয়ে গাড়ি রেখে পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক যেতেই মন্দির। সাদা মার্বেলের তৈরি। সামনে পাথর বাঁধানো চত্বর। পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নদীর তীরে। পর্যটক বেশ কম। মন্দির পেরিয়ে সামনের রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার উৎস গোমুখের পথে। মন্দিরের পাশে নদীর উপর লোহার পুল পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। মাথাগুলো বরফ আর মেঘের চাদরে ঢাকা। সকালের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে তার উপরে। সরু রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আরেকটি পুল পেরিয়ে চলে এলাম সূর্যকুণ্ডের সামনে। গঙ্গা অনেকটা লাফিয়ে পড়ে জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। অপূর্ব সে দৃশ্য। এপথে হেঁটে বেড়াতেই বেশ ভালো লাগে। নদীর দু-পাশে রয়েছে অনেক হোটেল, ধর্মশালা। অনেকটা সময় কাটিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এক অদ্ভুত ভালোলাগার রেশ রয়ে গেল মনে। হিমালয় বারে বারেই মানুষকে তার কাছে টেনে আনে। সেই টানেই আবার হয়তো কোনোদিন ফিরে আসবে এখানে।

যুগ যুগ জিও

ঋত্বিক দে

'যুগের হাওয়া' কিংবা 'এক যুগ হয়ে গেল'... এমন কথা তো শুনতে পাই হামেশাই। আর শুনলেই ভাবি, সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টার পরিমাপ তো জানি, আবার ঘণ্টা গুনে দিনের হিসেব কিংবা দিন গুণে বছরের হিসেব করতেও জানি, কিন্তু এই যুগের পরিমাপটা কী!

গম্ভীর গলায় জ্ঞানগর্ভ উত্তর আসে সঙ্গে সঙ্গে -১২ বছরে এক যুগ হয় শোনোনি কখনও আগে?

তখন ভাবি, তাহলে তো 'যুগ যুগ ধরে' ... কিংবা 'বহুযুগ আগে...' কথাটির মূল্য আছে। এ জীবনে তিনটে যুগও পেরিয়ে এসেছি এতদিনে।

কিন্তু যখন শুনি 'যুগাবতার' কিংবা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সেই অমোঘ উক্তি 'সম্ভবামি যুগে যুগে'... তখন ভাবি, তাহলে তো এর স্প্যান্ অনেক বড়ো হবে। কারণ আমার জীবদ্দশায় তো আমি অবতার দেখিনি কখনও নিজের চোখে। আর অবতার কল্প ধরেই যদি যুগের হিসাব করতে হয় কোনোভাবে তাহলে তো শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় তাকে খুজঁতে হবে। সেই সূত্রের ইতিবৃত্ত ঘাঁটতে গিয়ে দেখি সেখানে চারটি যুগের কথা বলা আছে। সত্য-ত্রেতা -দ্বাপর-কলি। কালচক্র অনবরত ঘুরছে নাকি এ চার যুগকেই সঙ্গে নিয়ে। এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে তো ১২ বছরের হিসেব ধরলে আমার এই ৪৫এ তিনটি যুগই পেরিয়ে এসেছি এতদিনে। আর এখন আছি ঘোর কলিতে এইভবে। তার মানে শৈশবের প্রথম ১২ বছর ছিলাম সত্য যুগে। সত্যিই সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। কোনো কিছুরই ভাবনা ছিল না মনে। বাবা-মায়ের স্নেহপরিজাতের সৌরভাকীর্ণ অমরাবতী আলো করে থাকতাম আমি, আর আমার সেই জীবন দেবতারা সব আপদ থেকেই আমায় আগলে রাখত বুকে করে। তারপর ১২ থেকে ২৪শে ছিল ত্রেতাযুগের কাল। নিরাপত্তার কড়া বেষ্টনীতে ব্রহ্মচর্য পেরিয়ে গার্হস্থ্যের প্রবেশ মুখ। ২৪ থেকে ৩৬এ দ্বাপর এল জীবন জুড়ে। আমার জীবনের বৃন্দাবনলীলার পাঠ শুরু হল সেখান থেকে। তারপর ৩৬ পেরোতেই পড়ল কলি। এখন ৪৮ পর্যন্ত এ কাল চলবে আমার সঙ্গে। এখন আমার কপালেও সত্যি ঘোর কলি বটে। কত যে চিন্তা মাথায় জমে বোঝা হয়ে, একটার সমাধান করতে-না-করতে আর একটা এসে দাঁড়ায় নিয়তি হয়ে। চারদিকে সমস্যাই সমস্যা। সাংসারিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা। চারপাশে তাকিয়ে চাহিদার ঊর্ধ্বসীমা ছোঁয়ার বাসনা প্রবল হলেও উপায় নেই কোনোভাবে।

তাই কলির নিয়ম মেনেই কত বুদ্ধিদীপ্ত শঠতা আর ছলনার আশ্রয় নিতে হয় মনে মনে। বাইরে সাধুর মুখোশ পরে অসাধুতার সুযোগ খুঁজি ঘুরে ফিরে। যে কোনো-ভাবে এ কলির মান তো বাঁচাতে হবে।

তারপর ভাবি এ ৪৮এর পর কী আবার পুরাণের কথামতো সত্য যুগের পুনরাবৃত্তি হবে? তা কী করে সম্ভব! বিস্ময় জাগে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি, কবি তো ভুল বলেননি কোনোভাবে-চবণমুনির পুত্র নাম রত্নাকর।

দস্যুবৃত্তি করে সেই ...

তার মানে কী রত্নাকর এবার বাল্মিকী হবে শেষে। তার মুখে 'মরা' থেকে 'রাম' এর কথা যখন কৃত্তিবাস লিখে গেছে তখন ভুল হয় কী করে। তাহলে নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক ভাবের বল্মিকতায় 'কলি' কাটবে এ জীবন থেকে। পাঁচ বারোম ষাট। বালাই ষাট।

তারপরেও যদি এ জীবনের নামতা এগোতে পারে তাহলে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হাতে আবার ত্রেতা আসবে কঠোর অনুশাসন হয়ে।

আর ৭২-এর বুড়োতে যে দ্বাপর জাগবে না, বলি কেমন করে। সাধে কি মধুকবি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লিখে গেছে।

তব ৮৪-র পরে আশা করা যায় না কিছু। তখন ঘোর কলি। সব স্পেয়ার পার্টসই নড়বড় করতে শুরু করে একে একে।

কিন্তু সমস্যা হল, আমার এ হিসেব পুরাণ নেবে না মেনে। এক অর্বাচীনের অজ্ঞানতা বলে উপেক্ষা করে যুগের ফিরিস্তি দেবে নতুন করে।

তাই যুগের হিসেব নিয়ে ভাবতে গিয়েই দেখি, সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের হিসেব কষা আছে বিভিন্নভাবে। সাহিত্যে এক শিল্প সংস্কৃতিতে আর-এক। হেরোডোটাসের ইতিহাসকেও নৃতত্ত্বের জাদুঘর থেকে টেনে বার করতেই তাতে আদি, মধ্য, বহমানের ত্রিযুগ চোখে পড়ে। যদিও তাদের একে অপরের সঙ্গে হিসেব

মেলে না কোনোভাবে। সাহিত্যের আদি আর ইতিহাসের আদিতে AD, BC -এর বিস্তর ফারাক চোখে পড়ে, তবুও খ্রিস্টকে মন্থনের মানদণ্ড করে সময়ের churning করে তারা।

আর্মেনীয়, অ্যাসিরীয়, বাহাই, বাংলা, বুদ্ধ, বর্মি, বাইজেন্টাইন, চিনা, কপটিক, ডিস্কর্ডীয়, বিক্রমসংবৎ, শক্ সংবৎ, হলোসিন, ইগবো , ইসলামি, জুশা, কোরীয়, মিঙ্গু বর্ষপঞ্জিগুলির যাত্রাপথ এক-এক সময় শুরু হওয়ায় বছরের বিন্যাস আছে সর্বত্র এলোমেলো হয়ে যেমন এই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির ২০২৩ই আব উর্ধ্বে কন্দিতায় হয়ে যায় ২৭৭৬, আর্মেনীয় বর্ষপঞ্জিতে ১৪৭২ আবার অ্যাসিরিয়ো বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী ৬৭৭৩ এভাবেই বাংলায় ১৪৩০ তো বাইজেন্টাইনে ৭৫৩২ এই বিভিন্ন বর্ষপঞ্জির যাঁতাকলে সবগুলিয়ে যায় একেবারে। তখন ভাবি সময়ের সঠিক পরিমাপটা কোথায় পাব খুঁজে। আর ভাবতে ভাবতেই সময়ের অ্যাবাকাস থিয়োরি মেনে যুগের জট কাটতে সাহিত্য ও ইতিহাসের তথাকথিত গণ্ডি ছেড়ে বিবর্তনের পথে জার্মান পোলার রিসার্চার Alfred Wegner -এর পথ ধরলাম ধীরে ধীরে। দেখলাম যুগের হিসেবটা অফিসিয়ালি সৃষ্টি হচ্ছে পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে। তখন গলন্ত লাভায় ভরা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড এই গ্রহ। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে।

তবে এ সময়ের হিসেব ধরতে অনেক ধরনের ক্যালেন্ডারই ক্যালকুলেট করেছিল অনেকভাবে, শেষপর্যন্ত জুলিয়ান আর গ্রেগরীয়ানই সার্বিক স্বীকৃতি পেল খ্রিস্টের ক্রুশে মাথা ঠুকে। সময়ের সীমারেখা সুনির্দিষ্ট হল এ দুই রোমান ফরম্যাটে। আধুনিক অতীত ও ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশ দিতে এল AD অর্থাৎ ডায়োনিসিয়াস অ্যানো ডোমিনী নস্ট্রি জেসু ক্রিস্টি আর সুপ্রাচীন অতীত তথা অন্ধ অতীতের সীমা ছুঁতে এল BC অর্থাৎ বিফোর ক্রাইস্টের থিয়োরি। সময়ের churning শুরু হল সেখান থেকে।

আর তাতেই সমুদ্রের মতো অতীত মন্থন করে একের পর এক যুগের তত্ত্ব উঠে এল আমাদের হাতে। জানা গেল ৪৬০ কোটি বছর আগের হেডিয়ান যুগে পৃথিবীর জন্মকথা। তারপর ৪০০ থেকে ২৫০ কোটির মধ্যে আর্কিয়ান যুগে ভূত্বক শীতল হতেই রুদ্রদেব শান্ত হয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন ধীরে ধীরে।

তারপর ২৫০ থেকে ৫৪ কোটির মধ্যে ১৯৬ কোটি বছর ধরে জল ও স্থলের সীমারেখা জাগল ধীরে ধীরে। এই প্রোটেরোজোয়িক যুগেই প্রাণের স্পন্দন প্রথম কম্পিত হল জলে। ফ্যানারোজোয়িক মহাযুগের যাত্রা শুরু হল এখান থেকে।

সময়ের সীমাকে সুনির্দিষ্ট করতে অনেক আগে থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিল গ্রিক দার্শনিকের দল। এ সৃষ্টির উৎস সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে নিরন্তর সে রহস্যের গহনে গিয়ে এক-একটি মহাযুগ, অধিযুগের আনুমানিক সীমায় লক্ষ্মণরেখা কেটেছিল এরা। যুগ পর্যায়ের নামেও নিজেদের দাপট বজায় রেখেছিল সমানভাবে। যেমন- প্রাচীন গ্রিক শব্দ phaneros -ফ্যানারোজ এবং zoe - জোয় থেকেই ফ্যানারোজোয়িক। অর্থাৎ প্রথম প্রাণ দৃশ্যমান হল যবে থেকে।

তবে যুগ বলতে তখন ছিল এক সুবিস্তৃত সময়ের সীমারেখা। বিবর্তনের ধারার উপর নির্ভর করে তার কালের চাকা ঘুরত ধীরে ধীরে। যেমন-হেডিয়ানের বয়স ৬০ কোটি বছর হলেও আর্কিয়ান ১৯৬ কোটি বছর টিকে রইল, তার বিবর্তনকে পাথেয় করে।

গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের আগে ৪৬ BC-তে সিজারের জুলিয়ান বর্ষপঞ্জিতেই প্রথম সৌরভিত্তিক বর্ষ বিন্যাসে ৩৬৫.২৫ দিনে বছরে সময়সীমার সিলমোহর দিয়েছিল। এরা তাকে ১২টি মাসে ভাগ করে। আর হিসাব মেলাতে অধিবর্ষের ১ দিন জুড়ে ছিল ৪ বছর অন্তর ঘুরে ঘুরে। সে নিয়মই সামান্য বদলে সর্বজন মান্যতা পেল পরে। ১৫৮২ AD র ২৪এ ফেব্রুয়ারি রোমান ক্যাথোলিক পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরির ইচ্ছা অনুসারে।

সেই থেকে গ্রেগরীয়ান খ্রিস্টকে churning করে AD থেকে BC তে চলল আদিম পৃথিবীর রহস্যের সন্ধানে গ্রিক দার্শনিকদের বিভাজিত যুগের কাল নির্ধারিত হল তখন এই গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার মেনে।

ফ্যানারোজোয়িক অধিযুগের তিনটি মহাযুগ-প্যালিও জোয়িক, মেসোজোয়িক ও সিনোজোয়িক। এ তিন মহাযুগ বিভক্ত হল ১২টি যুগে। ১২ সংখ্যাটি এই প্রথম মিলল যুগের সঙ্গে এসে।

কিন্তু ক্যাম্ব্রিয়ান থেকে পার্মিয়ান পর্যন্ত প্যালিও-জোয়িকের ছ-যুগেরই বিস্তারে বিস্তর পার্থক্য চোখে

পড়ে। ক্যাম্ব্রিয়ানের বিস্তার ৫.৬ কোটি বছর তো অর্ডোভিশিয়ানের বিস্তার ৪.৫ কোটি বছর। সিলুরিয়ানের বিস্তার ২.৫ কোটি বছর তো ডেভোনিয়ানের বিস্তার ৫.৬ কোটি বছর আবার কার্বনিফেরাসের বিস্তার ৫.৯ কোটি বছর তো পার্মিয়ানের জীবন এগোল ৫ কোটি বছর ধরে। তবে শ্যাওলা থেকে সেফালোপড, ট্রাইলোবাইট থেকে ডিমেট্রডন সকলেরই বিবর্তন ঘটেছিল এই পাটে।

প্যানথালাস ঘেরা প্যানজিয়া ঘিরে উদ্ভিদ আর প্রাণী জগতের বিভিন্ন পর্ব, উপপর্বের শৈশব কেটেছিল এই স্তরে। প্যালিওজোয়িকের ২৯ কোটি বছরের বার্ধক্যের পর যখনই প্যানজিয়াতে ফাটল ধরতে শুরু করল ধীরে ধীরে তখনই মেসোজোয়িকের পর্ব শুরু হল সেখান থেকে। এই মহাযুগ আবার তিনটি যুগে তার বিবর্তনকে সাজাল একে একে- ট্রায়াসিক, জুরাসিক আর ক্রিকেশিয়াস। এই ট্রায়াসিকের ৫ কোটি বছরের ব্যবধানে প্যানজিয়া ভাঙতে শুরু করতেই ফাইটোপ্ল্যাংকটন, প্রবাল, খোলশযুক্ত প্রাণী পুনরায় সৃষ্টি হল আরও বিবর্তিত হয়ে। সরীসৃপের আকার বাড়তে শুরু করল ধীরে ধীরে। পাইনবন, মশা, মাছি, প্রথম দৈত্যাকার কুমির এল মিষ্টি জলে। এরপর জুরাসিকের সাড়ে ৫ কোটি বছরের লাইফ স্প্যানেই পৃথিবী ভরে গেল কনিফার বনে।

স্টেগোসরাস থেকে ডায়নোসরাস, র‍্যাম্ফোর-হিনকাস এর সে এক দৈত্যাকার যুগ। প্যানজিয়া, লরেশিয়া আর গণ্ডোয়ানাতে ভেঙে গেল এই যুগে। তারপরেই এল ৭.৯ কোটি বছর বিস্তৃত ক্রিটেশিয়াস যুগ। ইওস্ট্রেপটোস্পোনডাইলাস, কার্কারোডন্টোসরাস, স্পিনোসরাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির ডায়নোসরের পাশাপাশি প্রথম পাখির উদ্ভব হল এই যুগে। টেরোসরা-সের সঙ্গে তাদের লড়াই শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে।

এই প্রথম ফুল ফুটল পৃথিবীর বুকে। কনিফার বনের ক্যাভেঞ্জার হিসেবে ক্যাঙারু দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করল বনে বনে।

ভয়ংকর উল্কার অগ্নিবলয়ে ডায়নোসর নিশ্চিহ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিনোজোয়িক মহাযুগ জাগল পৃথিবীর বুকে। তার প্রথম পর্বের প্যালিওজিন যুগেই প্রথম স্তন্যপায়ী এল পৃথিবীর বুকে। তার ৬.৬ কোটি থেকে ২.৩ কোটি বছর অর্থাৎ আনুমানিক ৪.৩ কোটি বছরের life span এ ইওসিন উপযুগেই সবুজ ঘাসে পৃথিবী গেল ভরে। এরপর নিওজিন যুগের ব্যাপ্তি হল ২.৩০৩ কোটি থেকে পঁচিশ লক্ষ আশি হাজার BC জুড়ে। এরই মায়োসিন উপযুগে এপিস বা নরবানরের ৩০টি প্রজাতির বিস্তার ঘটল ধীরে ধীরে। পৃথিবীর মানচিত্র বদলাল অনেকটা আজকের মতো করে।

মায়োসিনের পর প্লাইওসিন উপযুগেই জলবায়ুর নাটকীয় পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার অস্ট্রালোপিথেকাসের উদ্ভব হল প্রথম মানবীয় শাখার প্রতিরূপ হয়ে। পুরাণের সত্যযুগের সূচনা হল এখান থেকে।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে খ্রিস্টীয় ৬০০ অব্দের মধ্যে গ্রিক দার্শনিকেরা কিংবা ৭৫৩ BC থেকে ৪৭৬ AD -র মধ্যে রোমান পণ্ডিতেরা যখন সৃষ্টির আদি তত্ত্বের বিশ্লেষণে ব্যাস্ত বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ধরে ধরে তাদের যুগ চিহ্নিত করার কাজে, তার ঠিক আরও ৬০০ বছর আগে আনুমানিক ১৫০০ BC তে যুগতত্ত্বের ধারণা উঠে এসেছিল একটু অন্যরকমভাবে *বৈদিক সংহিতা* থেকে।

তাদের সেই গননা অনুযায়ী বৈদিক সত্যযুগের সূচনা হয়েছিল আজকের গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩৮, ৯১,১০২ খ্রিস্টপূর্ব আগে। এর সাথে গ্রিক দার্শনিকদের ফ্যানারোজায়িক পিরিয়ড মেলালে সেটা আসে সিনোজোয়িক মহাযুগের অন্তর্গত নিওজিন যুগের প্লাইওসিন উপযুগে। সে উপযুগ ছড়িয়ে ছিল ৫৩,৩৩, ০০০ BC থেকে ২৫,৮০,০০০ BC জুড়ে প্রায় ২৭, ৫৩,০০০ বছর ধরে। এরই মাঝামাঝি সময় থেকে বৈদিক সত্য যুগের বিস্তার ঘটে ৩৮,৯১,১০২ BC থেকে আর চলে প্রায় ১৭,২৮,০০০ বছর ধরে। অর্থাৎ প্লাইওসিন পেরিয়ে কোয়াটার্নারি যুগের প্লেইস্টোসিন উপযুগের মাঝামাঝি এসে।

জলবায়ুর নাটকীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রান্তীয় ঘাসে সারা পৃথিবী যায় ভরে। ভারতীয় মৌসুমি বায়ুর সূত্রপাত ঘটে ধীরে ধীরে। মধ্য এশিয়া, সাহারায় একের পর-এক সুবিস্তৃত ভূমি বালিতে যায় ঢেকে। মহাদেশ আর মহাসাগরগুলি বর্তমানের আকার নিতে শুরু করে একটু একটু করে। অস্ট্রালোপিথেকাসের বিবর্তনও হতে থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। সাহারা, নামিব, কালাহারি তখন আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। ম্যামথ, দৈত্যাকার স্থলজ

শ্লথ, সুবিশাল শ্বদন্তযুক্ত বাঘ, ভয়ানক নেকড়ে, গুহার সিংহ, রোমশ গন্ডার, মেগালোসেরোস, ঘোড়া সর্বোপরি হোমোস্যাপিয়েন্স এর আবির্ভাব হল ধীরে ধীরে।

তবে বৈদিক সত্যযুগ গননার অনেক আগেই আনুমানিক ৫৫ থেকে ৪৫ লক্ষ বছর আগে এই প্লাইওসিন উপযুগেরই প্রথম দিকে টেকটেনিকস এর টেকনিক্যাল ফল্ট আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব ভুমিখণ্ড থেকে খসে বর্তমান ভারতীয় ভূখণ্ড এগিয়ে এসে এশিয়ার প্লেটে সজোরে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে টেথিস শুকিয়ে জাগরস পর্বতমালা উঠেছিল জেগে। সেই পর্বতই হিমের প্রভাবে হিমালয় হয়ে উঠল সত্যযুগে।

ত্রেতা এল ২১,৬৩,১০২ খ্রিস্টপূর্ব আগে। অর্থাৎ প্লেইস্টোসিন উপযুগের মধ্যভাগে। বৈদিক হিসাব অনুযায়ী ত্রেতার বিস্তার ঘটে ১২,৯৬,০০০ বছর ধরে। তখন প্লেইস্টোসিনের প্রদীপ নিভে পশ্চিমের ক্যালেন্ডারে হলোসিন জাগছে ধীরে ধীরে।

সত্যযুগকে কেউ কেউ কৃত যুগও বলে। বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ার আদিত্য বারে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮,৯১,১০২ বছর আগে এ যুগ এসেছিল বৈদিক মতে। বলি, বেণ, মান্ধাতা, পুরোরক, ধুন্ধুমার, কার্তবীর্যার্জুন এই ছয় শাসকের শাসন ছিল এই যুগের ১৭,২৮,০০০ বছরের পরম্পরা ধরে। শুনেই ভাবি মানুষের গড় আয়ু তখন কত ছিল তবে।

পুরাণ মতে তা যদি ৪০০ বছরও হয়ে থাকে, তবে তো পরম্পরা ধরনে ৪০০x৬=২৪০০ বছর হবে। তবে কি কি বাকি সময়টা আদিম অবস্থায় বিবর্তনেই গেছে কেটে। সেটাই স্বাভাবিক। এরা হয়তো রাজত্ব করেছে শেষ ২৪০০ বছর ধরে। হিন্দুশাস্ত্র মতে সত্য যুগের পরবর্তী যুগগুলির দৈর্ঘ্য নাকি কমেছে সে যুগের এক চতুর্থাংশ করে।

আদিম প্রকৃতির সেই উদভ্রান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে একের পর-এক পরিস্থিতিকে সামনে দেখে সন্ত্রস্ত সেই মানবের দল ভয়কে জয় করতে কোনো কিছুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল কোনোমতে। সেই ভয় থেকেই ভক্তি আর তার সঙ্গে ভালোবাসা মিলে ভগবান আবির্ভূত হলেন বিশ্বজুড়ে।

সত্যযুগে তিনিই নারায়ণ। বেদা, অক্ষরা, পরামুক্তি, পরাগতির অধিপতি। বিবর্তনকে স্পষ্ট করতে এলেন মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ এই চারটি অবতারে। ইন্দ্র, চন্দ্র, অরুণ, বরুণ তখন সকলের মনে বিরাজ করছেন ত্রাতা হয়ে। তাদের সেই দেবী তেজের বিরাট ব্যাপ্তি মানব মনে ছায়া আঁকল অসীমের ধ্রুবকে। ফলে স্বর্গ, মর্ত্যে সময়ের ফারাক বিরাট হল ধীরে ধীরে।

মর্ত্যের ৩৬০ সৌরবছর দেবলোকের ১ বছর নির্ধারিত হল সত্যযুগে। সেই হিসাবে মর্ত্যের সত্য যুগের ১৭,২৮,০০০ বছর, ৪৮০০ বছরের সমান হল দেবলোকে। দিনের উষা আর সন্ধ্যার মতো, যুগের ঊষা আর সন্ধ্যাও আসে নিয়ম মেনে প্রতিটি যুগে। গ্রিক দার্শনিকদের ফ্যানারোজোয়িক যুগ বিশ্লেষণেও সে ছবি ধরা পড়েছে অনেক আগে। প্রতিটি মহাযুগ, যুগ আর উপযুগের শেষ আর শুরুতেই দেখেছি সে যুগের বিবর্তিত প্রাণের উদ্ভব আর বিনাশের শৃঙ্খল। যেগুলোকে তারা চিহ্নিত করেছেন 'দ্য গ্রেট ডায়িং' শব্দটি দিয়ে। পরিবর্তিত পরিবেশ, পরিবর্তিত আবহাওয়া অপরিবর্তিত প্রাণের ধ্বংস ডেকে এনেছে বারবার। আবার নতুনের উত্থান হয়েছে পরবর্তী উষা যুগে।

সেই উষা আর সন্ধ্যার মতো, সত্যযুগের দেবলোকের ৪০০০ বছরের সঙ্গে ৪০০ করে উষা আর সন্ধ্যা যুক্ত হয়ে ৪৮০০ বছরের দৈব সত্য মানব সত্যে বিস্তারিত হয়েছিল ১৭,২৮,০০০ বছর ধরে।

ত্রেতাতে তা এক চতুর্থাংশ কমতে ৩৬০০ হল ৩০০ করে উষা সন্ধ্যা যুক্ত হয়ে। মর্ত্যের হিসাবে ১২,৯৬,০০০ বছরের পরিসীমা।

দ্বাপরে তা আবার কমে ২৪০০ দৈব বছর হল ২০০ করে ঊষা সন্ধ্যা যুক্ত হয়ে। মর্ত্যের হিসেবে ৮,৬৪,০০০ বছর গেল পার হয়ে।

সবশেষে এল কলি। মাত্র ৩১০২ খ্রিস্টপূর্ব আগে। এটা ২০২৩, মানে মাত্র ৫১২৫ বছর বয়স হয়েছে সবে। এ কলি গড়াবে এখনও ৪,২৬,৮৭৬ বছর ধরে। কারণ শাস্ত্রমতে এ কলি শেষ হবে ৪,২৮,৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে গিয়ে। নয়তো দৈবলোকের ১২০০ বছরের যুগ সম্পূর্ণ হবে কী করে? দেবলোকের এই ১২০০ বছর মানেই তো মানবলোকের ৪,৩২,০০০ বছরের এক যুগ। তার মানে কলি থেকে সত্যের Reverse order এ দৈব বছরের হিসাব এগিয়েছে ১২ কিংবা ১২০০-র নামতা ধরে।

কলি যদি হয় ১২০০ দৈব বছর তো, দ্বাপর ১২০০x২=২৪০০ দৈব বছর, ত্রেতা ১২০০x৩

=৩৬০০ দৈব বছর তো সত্য ১২০০x৪=৪৮০০ দৈব বছর। আর মর্ত্যের হিসেবানুযায়ী কলির ১২০০ দৈব বছর ৪,৩২,০০০ সৌরবছরের সমান যেহেতু আর এ সমানের অঙ্ক যেহেতু পুরাণ মতে ৩৬০ সৌর বছরে দেবলোকের ১ বছর ধরে তাই ১২০০x৩৬০=৪,৩২, ০০০ বছর। আর সেই সূত্র ধরেই দ্বাপরের বয়স ৪, ৩২,০০০x৩ =১২,৯৬,০০০ সৌরবছর আর সত্যের বয়স ৪,৩২,০০০x৪ =১৭,২৮,০০০ সৌরবছর।

এই দেবলোকের ১২০০ বছরই স্মৃতি-বিস্মৃতির রকমফেরে অপভ্রংশ হতে হতে ১২-তে এসেছে নেমে। সত্যের মতো ত্রেতা, দ্বাপরেও নারায়ণ অবতার রূপ ধরেছিলেন বারে বারে। আর এই কলিতে যেহেতু পাপের ভারে ধর্মের চারপাদ একপাদে ঠেকেছে এসে, তাই দুই অবতার ধর্মের গ্লানি মোছাতে এসে গেছেন এরই মাঝে। শুনেছি আরও একজন আসবেন... শেষে কল্কি হয়ে।

যদিও এসবের হিসেবে বিস্তর বিতর্ক আছে। রেনেগুয়েন, অ্যালেন ড্যানিয়েলরা অনেক হিসেব দিয়েছেন নতুন করে। তবে সেসব ছেড়ে এখন একটাই কথা মাথায় ঘোরে ফেরে; যুগের হিসেব ১২০০ বছর থেকে ১২ বছরে নামিয়ে আনল কারা? কী করে? তাও আবার দৈব বছর। যার লক্ষ বছরের ব্যবধান রয়েছে মর্ত্যের সঙ্গে।

(বড়িশা, কলকাতা)

'নিবেদন' ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা (ডিঃ ২০২২) প্রকাশের কিছু মুহূর্তের ছবি।

মার্গসংগীত-এর গল্পগাথা রূপকথা

ড. অমলেন্দু হাজরা

মার্গসংগীত নিয়ে যে ঠাট্টার রসালো গল্পটা আছে ভারতের সর্বত্র অদলবদল হয়ে তা বহুল প্রচারিত অনেকের জানা তবু বলি সেটা হল।

বেনারস ঘরানার এক নামজাদা ওস্তাদ এসেছেন বাংলার এক খানদানি জমিদার বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। সময় হল অনুষ্ঠানের জমিদারের বিশাল ঝাড় লণ্ঠনের প্রমোদ ঘরে। সারা ঘর ভিড়ে ঠাসা। ওস্তাদ নির্দিষ্ট সময়ে চোখ বুজে গান ধরলেন। আর খেয়াল গান যতই এগোয় ভিড় ক্রমশ পাতলা হতে থাকল। তারপর যখন তিনি গান শেষ করে চোখ খুললেন দেখলেন একজন মাত্র লোক তার সামনে দামি কার্পেটের উপর বসে। পিছনের সব কার্পেট গুটিয়েএকপাশে ডাঁই করে রাখা হয়েছে। ওস্তাদ বুঝলেন এই একটা লোকই তার গানের সমঝদার। তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ভাই তুমিই একমাত্র ওস্তাদি গানের কদর বোঝ।

লোকটা ধীরে ধীরে ওস্তাদের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বলল, না মশাই না- আমি বসে আছি আপনি যে দামি নরম মখমলের গদিতে বসে গান গাইলেন তা নিতে। আপনার গান শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বসে আছি। মালিক বলেছে যদি সব দামি কার্পেট মখমল গদি ফেরত না আসে একটাও খোওয়া যায় তবে আমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখবেন না। তাই গান শেষ হবার অপেক্ষায় ছিলাম। এখন গান গাওয়া শেষ হয়ে গেছে আপনি তাড়াতাড়ি ভিতরে যান আমিও সব গুছিয়ে মালিকের কাছে জমা দিয়ে আসি।

সাধারণ লোকেদের মার্গসংগীত নিয়ে ভাবনাচিন্তার ব্যঙ্গ গল্প এটা। তবে বিভিন্ন প্রাচীন বইয়ে অন্য গল্প গাথা আছে মার্গসংগীতকে প্রশংসা করে। বলি তেমন কাহিনি:

মধ্যযুগে লক্ষ্মণ সেনের আমলে রচিত 'সেক শুভোদয়' নামে একটা বই আছে তাতে গ্রন্থ প্রণেতা সেক জালালুদ্দিন লক্ষ্মণ সেনের সভায় এক সংগীত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন। এই সময়ে রচিত আর একটি বই সদুক্তি কর্ণামৃতের একটা শ্লোকে বলা হয়েছে কবিনট গঙ্গোকের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা বিদুষী সংগীত শিল্পী ছিলেন। তিনিও ওই দিনের ওই সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। জালালুউদ্দিনের সেই সভার বর্ণনা হল- বিদ্যুৎপ্রভা প্রথমে গান গাইলেন 'সুহই' রাগে (সুহা কানাড়া বা শুদ্ধ সুহা রাগে) রাজা এবং অন্যান্য শ্রোতারা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। এখন ওই সভার কাছেই ছিল একটা পাতকুয়ো। কাছের এক গৃহবধূ ছেলে কোলে করে কলশি দড়ি দিয়ে পাতকুয়ো থেকে জল তুলতে এসেছিল। চন্দ্রপ্রভার গান শুনে এত বিস্মৃত মুগ্ধ হয়ে গেল যে কলশির বদলে ছেলেকে দড়ি বেঁধে পাতকুয়োয় নামিয়ে দিল জল তোলার জন্য।

তারপর গান ধরলেন উড়িশ্যার রাজার কাছ থেকে উড়িশ্যার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের জয়পত্র নিয়ে ওস্তাদ বূঢ়ন মিশ্র। তাঁর বাসনা এভাবে বাংলা-বিহার-অসম রাজাদের কাছ থেকে জয়পত্র নিয়ে পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বলে পরিচিত হওয়া।

তিনি পটমঞ্জরী রাগে আলাপ আরম্ভ করলেন। আর সভার কাছে একটা পিপল গাছ ছিল তার সব পাতা ঝরে গেল। সবাই হই হই করে উঠল, 'অপূর্ব' বললেন সবাই। রাজা তাকে বলল হ্যাঁ জয়পত্র পাওয়ার যোগ্য আপনি। আপনাকে জয়পত্র দেব।

এখন *গীতগোবিন্দ* প্রণেতা জয়দেব মিশ্রর পত্নী পদ্মাবতী ওই সভার পাশ দিয়ে গঙ্গা স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তিনি রাজসভায় কোলাহল শুনে এসে সব শুনে রাজাকে বললেন আমি আর আমার স্বামী জয়দেব মিশ্র থাকতে কে বাংলা থেকে সংগীতের জয়পত্র নিয়ে যেতে সাহস করে। জয়দেব ছিল লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার সভাকবি তাকে এবং পদ্মাবতীর গুণপনা রাজা ও সভাসদরা সব জানত। বূঢ়ন মিশ্র বলল তোমার স্বামীর গুণপনা পরে জানা যাবে আগে তোমার সংগীত বুৎপত্তি দেখি।

পদ্মাবতী রাজা, সভাসদ ও বূঢ়ন মিশ্রকে বলল, হ্যাঁ গান শোনাচ্ছি এই বলে গঙ্গাস্নান মুলতুবি রেখে 'গান্ধার' রাগে আলাপ আরম্ভ করলেন। আর দেখা গেল গঙ্গায় যত নৌকো ছিল সব এসে রাজসভার কাছে রাজঘাটে এসে ভিড় করেছে। তা দেখে সবাই বলল, পিপল গাছের প্রাণ আছে তার পাতা ঝরানো গাছের পক্ষে সম্ভব কিন্তু নৌকোরা প্রাণহীন তারাও যখন গান শুনে রাজঘাটে উপস্থিত হয়েছে সেটা বেশি আশ্চর্যজনক।

পদ্মাবতী বলল মহারাজ এবার আমার স্বামীকে আমার কথা বলে ডাকান। রাজা লোক দিয়ে জয়দেব

মিশ্রকে সভায় ডেকে আনলেন।

জয়দেব সব শুনে বলল আমার পত্নীই তো জিতেছে। বসন্ত কালে পিপল গাছের পাতা এমনিতেই ঝরে যায় এতে আশ্চর্য কি? সভাসদরা বলল একসঙ্গে ঝরে যাওয়া আশ্চর্যের বই কী?

জয়দেব বলল বুঢ়ন মিশ্র কি ওই পিপল গাছে আবার সব পাতা গজাতে পারবেন- তাহলে জয়পত্র তিনি পাবেন।

বুঢ়ন মিশ্র বলল তা তিনি গজাতে পারবেন না- আপনি পারবেন? তাহলে জয়পত্র আপনিই পাবেন।

জয়দেব তখন বসন্ত রাগে আলাপ আরম্ভ করলেন। দেখতে দেখতে পিপল গাছের সব পাতা আবার গজিয়ে গাছ সবুজ সতেজ হয়ে গেল। সভায় জয়ধ্বনি হল। মহারাজ জয়দেবকে জয়পত্র দিলেন। বুঢ়ন মিশ্র লজ্জায় পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ যাত্রা বন্ধ করে উড়িশ্যায় ফিরে গেলেন।

অনেকেই মনে করেন পদ্মাবতী প্রথম জীবনে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী নটী ছিলেন। জয়দেবের পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী পদ থেকে অনুমান করেন জয়দেব তার *গীতগোবিন্দ* গাইবার জন্য একটা দল নিয়ে তা গেয়ে পুরীর পান্ডাদের তুষ্ট করে পদ্মাবতীকে লাভ করে ছিলেন। পরে পদ্মাবতী জয়দেবের দলে গানের সঙ্গে নাচতেন এবং জয়দেব মৃদঙ্গ বাজাতেন, দোহারের কাজ করতেন এবং নাচের ফাঁকে ফাঁকে গানও গাইতেন।

এবার কিংবদন্তী গল্পগাথায় আসি। তানসেনের মৃত্যু গল্পে আর তার গুরু সাধক হরিদাসের গানের গল্প গাথায়।

তানসেন ছিলেন আকবর বাদশার সভা গায়ক আর তার প্রধান গুরু ছিল সাধু হরিদাস। আকবর বাদশার দম্ভ ছিল তার রাজকোশে যত মণি মাণিক্য রত্ন অলংকার আছে তা পৃথিবীর কোনো রাজার ভাণ্ডারে নেই। এ হেন বাদশা একদিন তানসেনকে ধরে বসলেন তাঁকে তার গুরুদেব সাধু হরিদাসের গান শোনাতে হবে। তানসেন যতই বলেন গুরুদেব কাউকে গান শোনান না, কোনো অনুষ্ঠান করে গান গান না, কেবল ইষ্টদেবকে গান গেয়ে সাধনা করেন। বাদশা বলেন তাকে হরিদাসের গান শোনাতেই হবে।

অগত্যা তানসেন বাদশাকে নিয়ে চললেন খুব ভোরে গুরুদেব যখন ইষ্টদেবের উদ্দেশ্যে গান গান। আকবর গান শোনেন-আর দেখেন যতই হরিদাসের গান এগোতে থাকে সামনের প্রান্তর মণিমাণিক্য রত্ন অলংকারে ভরে ওঠে- ক্রমে একটা দীর্ঘ পাথর ছাড়া সারা প্রান্তর মণিমুক্তো, রত্ন, অলংকারে ভরে গেল। হরিদাস নিজের মনে যেন বলে উঠলেন, পারবে তোমার রত্ন মাণিক্য দিয়ে ওই পাথরটাকে ভরাতে। আকবর বাদশার মাথা হেট হয়ে গেল আর ম্লান মুখে ফিরে এলেন- ওই পাথর ভরানোর মত মণিমাণিক্য অলংকার তার রাজকোশে নেই।

১৫০৫ মতান্তরে ১৫৩২ এ মকরন্দ পাঁড়ে বা মুকুন্দরাম পাঁড়ে নামে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ গৃহে (অর্থাৎ তানসেন বাঙালি) তানসেন বা রামতনু পাঁড়ের জন্ম হয়। মুকুন্দরামের কোনো ছেলেমেয়ে দশ বছরের বেশি বাঁচেনি। দীর্ঘায়ু পাওয়ার জন্য পিতা মুকুন্দরাম মৃত্যুর আগে তানসেনকে তার ধর্মপিতা ফকির মোহম্মদ গাউস যার কৃপায় তানসেন দীর্ঘায়ু হন তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার নির্দেশ দেন। রামতনু গোয়ালিয়রে এসে ধর্মপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মোহম্মদ গাউস তাকে নিয়ে তার আশীর্বাদ ধন্যা গোয়ালিয়রের রানি মৃগনয়নীর সঙ্গে পরিচিত করান। রাণী সংগীতজ্ঞা ছিলেন। সংগীতে প্রথম পাঠ তার কাছেই। মৃগনয়না সাধু হরিদাসের শিষ্যা ছিলেন। তার সাহায্যে তানসেন হরিদাসের কাছে শিক্ষা পান। রামতনু রাজপ্রাসাদে থাকতেন। সেখানে মৃগনয়নীর এক সেবিকা ব্রাহ্মণ কন্যা প্রেমকুমারী যিনি পরে মুসলমান হন তার প্রেমে পড়েন। প্রেমকুমারীর নাম হয় হোসনী ব্রাহ্মণী। মৃগনয়নী তাদের বিয়ে দেন এবং ধর্মান্তরিত রামতনুর নাম হয় মোহম্মদ আতা আলি খাঁ। পরে তিনি বেওয়ারের মহারাজা রাজারামের সভা গায়ক হন। আর আকবর বাদশা তার সুনাম শুনে নিজের সভায় এনে সভাগায়ক করেন এবং নাম দেন তানসেন বা তানসুর লহরী অর্থাৎ যার গান শুনে হৃদয় দ্রবীভূত হতে সক্ষম। সবাই ভুলে যায় তার পূর্ব নাম।

এখন তার সুনামে ক্রমে একদল গায়কের মনে ঈর্ষা বিদ্বেষ সৃষ্টি হল আর সভাসদের একাংশ তাকে বাদশার প্রিয়পাত্র দেখে জ্বলে পুড়তে লাগল। সবাই মিলে যুক্তি করে তানসেনের অপমৃত্যুর এক উপায় বার করল তারা বাদশাকে বলল আপনি তানসেনকে দীপক রাগে একদিন গান গাইতে বলুন। তানসেন বুঝল বিদ্বেষীদের মনের

কথা- অভিসন্ধি। কাল হবে পরশু হবে বলে তানসেন টালবাহানা করতে লাগল যতই, ততই আকবর বাদশা তানসেনকে ওই রাগ গাওয়ার জন্য জেদ করতে লাগলেন-ভিতরের অভিসন্ধি কিছু বুঝতে পারেননি তিনি।

এখন দীপক রাগ গাইতে তানসেনের এত দ্বিধা কীসের! প্রকৃতপক্ষে দীপক রাগ বিশুদ্ধ রাগে গাইলে বা বাজালে এ রাগের সুর যতদুর যাবে সেখানে আগুন ধরে যাবে তারপর বাদ্যযন্ত্রে এবং গায়ক বা বাদকের শরীরে। তাই তানসেন তার কন্যা সরস্বতীকে এবং গুরুভগিনী রূপমতীকে উত্তম রূপে মেঘ রাগ শিখিয়ে রাখলেন। তারপর একদিন প্রস্তুত হয়ে ওদের নিয়ে গান ধরলেন আলাপ যতই এগোয় ততই চারদিকে আগুন ধরে যেতে লাগল, আগুন দেখে হই হই কোলাহল ছুটোছুটি আরম্ভ হল। আর তাতে কন্যা সরস্বতী ও গুরুভগিনী রূপমতীর মেঘ রাগ সুর করতে একটু দেরি হয়ে গেল। তানসেনের দেহে আগুন লাগল। পরে মেঘ রাগে বৃষ্টি নামল। আগুন নিভল এবং তানসেনের দেহ কিন্তু ওই সামান্য দেরির জন্য যথেষ্ট ক্ষতি হল। তানসেন অবসর নিলেন। আর কিছুকাল পরেই মারা গেলেন।

দীপক রাগের মতো আগুন ধরায় আর একটা রাগ আছে লঙ্কাদহন সারং। শোনা যায় তার পুত্র প্রপৌত্রদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তার জন্য তানসেন বলে গিয়েছিলেন তার মৃতদেহের সামনে সবাই একে একে গান গাইবে। যার গান শুনে ওর হাতের আঙুল উঠবে সেই হবে তার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। শোনা যায় বিলাস খাঁর দিকে তার আঙুল উঠেছিল।

এবার সত্যি ঐতিহাসিক গল্পগাথার কথায় আসা যাক। নর্মদা নদীবেষ্টিত সারঙ্গপুরের দুর্গপতি থান সিং রাঠোরের রূপবতী কন্যা ছিল রূপমতি। সংগীত বিদুষী। সকালে সংগীত সাধনা করতেন। কথিত আছে পশুপক্ষী পর্যন্ত তাতে মোহিত হয়ে তাকে ঘিরে ধরত। বিয়ে হয় চান্দেরী রাজপুত্রর সঙ্গে। নর্মদা নদী প্রিয় রূপমতীর সেখানে নর্মদা নেই বলে পতিগৃহ ভালো লাগে না, ফিরে আসেন পিতৃগৃহে। ইতিমধ্যে শেরশাহ মালব জয় করে সুজাত খানকে ভার দেন মালবের। তার মৃত্যু হলে পুত্র বায়াজিদ খান বাজবাহাদুর নাম নিয়ে রাজা হন মালবের। তিনিও সংগীতপ্রেমিক ছিলেন। একদিন রূপমতির সংগীত শুনে মুগ্ধ হন। পরিচয় করেন বিয়ে করার সম্মতি দেন রূপমতি। শর্ত ছিল নর্মদাকে যদি মান্ডু আনেন তাহলে তিনি মান্ডুতে তার সঙ্গে যাবেন। বাজবাহাদুর নর্মদার সঙ্গে রেবা নদীর বা কুণ্ডর সঙ্গে যোগ করে দেন। রূপমতির প্রিয় রাগ কল্যাণ আর বাজবাহাদুরের বিলাবল। পিতা বিয়ের আগে বিষপানের নির্দেশ দেন সুতরং বাজবাহাদুর রাত্রে দুর্গ আক্রমণ করে রূপমতীকে নিয়ে চলে আসেন মান্ডু। বেশ ছিলে কিছুদিন। আকবর ১৫৬০-এ মালব জয় করার জন্য আজম খাঁকে পাঠান। যুদ্ধে বাজবাহাদুর পালান আর রূপমতি ছদ্মবেশে ফুলওয়ালি সেজে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে আজম খাঁ বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাজি নাহলে পিতার দুর্গ আক্রমণ করবেন। তিনিদিন সময় চান। বাজাবাহাদুরকে ভোলার। তৃতীয় দিনে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রূপমতি বধূ সাজে আসেন আজম খাঁ বর সাজে। তারপরই আজম খাঁর সামনে মারা যান হীরকচূর্ণ খেয়ে।

অনেকে অবশ্য মনে করেন রূপমতি প্রকৃত ছিল সংগীতজ্ঞা নটী এবং বারবধূ। সুতরাং মুক্ত বিহঙ্গী তার প্রেমের কাছে ধর্ম ছিল মূল্যহীন। তার কাছে রূপমতী বাজবাহাদুর এর সৃষ্ট রাগ হল ভুপালি এবং কল্যাণ মিশ্রিত রাগ ভুপকল্যাণ। দক্ষিন ভারতে আজও রূপমতি বাজবাহাদুরের প্রেমকাহিনি একটা বিখ্যাত থিম দেওয়াল চিত্রে রচিত হয়ে আছে। কাপড়-উল-বস্ত্রের উপর নকশার কাজে।

এবার বাংলার গল্পগাথায় আসা যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে *চর্য্যাপদ* বলে আদি বাংলা ভাষার একটা বই উদ্ধার করে আনেন। বইটি দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধতান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু সময়ের। বইটাতে বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধক সাধিকারা নানা রাগে সান্ধ্য ভাষায় দিনে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে ভিক্ষা করত। রাতে সাধনা করত। রাগগুলোর মধ্যে আছে নটমঞ্জরী, গুর্জরি, গাবড়া, বলাড্ডি ইত্যাদি। এসব গান ছিল আভিচারিক গান অর্থাৎ মনোবাসনা মেটানোর জন্য তান্ত্রিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে গাওয়া গান। নটমঞ্জরী, গুর্জরি মার্গসংগীতে স্থান পেলেও তার আভিচারিক স্বরগম কি ছিল জানা যায়নি। গাবড়া বা বলাড্ডি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ওই সময়কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত অপূর্ব সৃষ্ট গল্প 'মেঘ মল্লার'। বাঁশিতে মেঘমল্লার রাগের আভিচারিক গান গেয়ে দেবী সরস্বতীকে বন্দি করা এবং মুক্ত করার কাহিনি। বর্ত্তমানে সংগীত নিয়ে উপন্যাস

আছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *'অসিধারা'*।

বাংলায় এককালে বহুল প্রচলিত টপ্পাগান স্রষ্টা রাম নিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর কথায় আসা যাক। টপ্পা গানের উদ্ভব হয় পাঞ্জাবে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে যারা উটে চড়ে মরুভূমি গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করে আসত তারা রাত্রি কালে গান গাইত এক করুণ সুরে- বিশেষ আন্দোলন যুক্ত স্বরে-নাম জমজমা। লাহোরে উটগুলো বদল হত। পাঞ্জাবের এই গান অযোধ্যার গোলাম নবী উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রবর্তন করেন। তার স্ত্রীর নাম শোরী-তিনিও সংগীতবিদ ছিলেন। টপ্পা গান লেখেন। আর টপ্পা গান পরিচিত হয় শোরী মিয়ার টপ্পা বলে। নিধিবাবু বাংলায় এর চল করেন। আমরা গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে যার নমুনা পাই। পরে অন্যান্য বাঙালি গীতিকার যথা শ্রীধর আচার্য প্রমুখরা টপ্পা গান লিখেছেন।

(এই লেখায় আমার পিতৃদেব মন্মথনাথ হাজরার লেখা সাহায্য করেছে)

(শিশির বাগান রোড, কলকাতা)

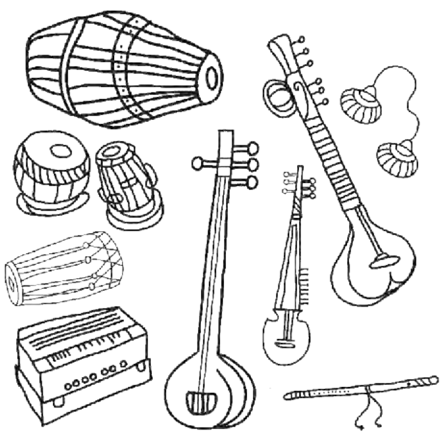

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আলোকে মাদক দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার

ড. দেবদাস মণ্ডল

মানুষের শতবর্ষ আয়ু লাভের উপদেশ দেয়, সেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যদি মদ ও মাদক দ্রব্য সেবন বিধি নিয়ে পরামর্শ পাওয়া যায় তখন মদ্যপিপাসুদের মনে হতেই পারে যে, আয়ু-বল-বীর্য-বর্দ্ধক 'মদ ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে যাঁরা করছে প্রতিবাদ তাঁদের মাথায় পড়ুক বাজ।' কেন-না, এই মাদক দ্রব্য সেবন নিয়ে আজকাল এত কথা! এত শোরগোল! কিন্তু মদ্যাসক্তির বিষয় তো আজকে নতুন কিছু নয়, সেই বৈদিক যুগ থেকে দেবরাজ ইন্দ্রের সোমাসক্তির কথা কে-না জানে? সোমরস পানে ইন্দ্রের উদর এতটাই স্ফীত হত যে, তা সোমরসের হ্রদের সঙ্গে তুলনা করা হত।[১] আজ অতি সস্তায় যেখানে বাংলা মদের দেদার কারবার, বর্তমান ভাঁড়ার শূন্য সরকারের যেটি আয়ের অন্যতম উৎস! সুরাপ্রেমীদের জন্য আগামীতে 'দুয়ারে মদ'-এর পরিকল্পনা! সেখানে মাদক দ্রব্যের সেবন নিয়ে যত কম কথা বলা যায় তত ভালো। তবে বর্তমান সরকারকে শুধু দোষারোপ করে কী লাভ? সেই খ্রিস্টপূর্ব যুগে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুরাধ্যক্ষের পরিচালনায় নির্দিষ্ট স্থানের (দুর্গে, জনপদের-স্কন্ধাবারে) বাহিরে সুরা উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়কারীদের উপর ৬০০ পণ দণ্ডের (কর গ্রহণের) বিধান ছিল।[২] শুধু তাই নয়, রাজপণ্য হিসেবের বাইরে নিজের উৎপাদিত পণ্য হিসেবে মদ্য প্রস্তুত করে বিক্রয় করলে শতকরা পাঁচপণ করে দণ্ডের বিধান ছিল। ঠিক যেমন আজকাল সরকারের লাইসেন্স নিয়ে মদ্যোৎপাদন বা ক্রয়বিক্রয় আর বিনা লাইসেন্সে মদের ক্রয়বিক্রয় করা হয়। বস্তুত, এই উভয় প্রকারেই রাজ সরকারের আবগারি দপ্তর থেকে বৈধ ও অবৈধ (ঘুর পথে) ভাবে প্রচুর অর্থ আদায় হয়ে থাকে। যাইহোক, রাজ-সরকারের আর্থিক দুরবস্থার কথা না ভেবে স্বাস্থ্য সচেতন মনুষ্যসমাজ যখন মাদক দ্রব্য সেবন নিয়ে বেশি চিন্তিত, সেখানে মদ ও মাদক দ্রব্য সেবন নিয়ে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের দু-চারটি পরামর্শ হয়তো এযুগের নেশা ভাঙাসক্ত ভাঙড়-ভোলাদের কিছুটা হলেই বিধি মেনে মদ্যপানে আগ্রহ জাগাতে পারে। এখন প্রশ্ন- মাদক দ্রব্য সেবনে কী কী রোগ হতে পারে? সেইসব রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে আয়ুর্বেদে কী কী পরামর্শ পাওয়া যায়? আয়ুর্বেদ মতে কীভাবে মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করা বা সেবন করার বিধান আছে? মাদক দ্রব্য সেবনের উপকারিতা কী? এইসব কৌতূহল থেকেই বর্তমান নিবন্ধের ভাবনা।

ধূমপান :

ধূমপান বলতে বোঝায় ধোঁয়া গ্রহণ, তামাক জাতীয় পদার্থ আগুনে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া পান বা গ্রহণের প্রক্রিয়া হল ধূমপান। 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর'- এই প্রবাদ জেনে-বুঝেও মানুষ যথেচ্ছ ধূমপান করে থাকেন। সেটা তামাক, চুরুট বা বিড়ি, সিগারেট, হুঁকার ধূম, যাই হোক-না-কেন- ধূমপান যেন কলি যুগের বাবু সমাজের যেন একটা স্টাইলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিজের অজান্তেই কী প্রকারে যে নিজের মারণব্যাধি সৃষ্টি করছেন তা বুঝেও বুঝতে চান না। ধূমপানজনিত কারণে কাশি, শ্বাসকষ্ট, হার্ট আক্রান্ত, স্ট্রোক, ক্রণিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (COPD) এমফাইসিমা ও ক্রণিক ব্রংকাইটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তারবাবু উপায়ান্তর না দেখে যখন সম্পূর্ণরূপে ধূমপান বর্জনের পরামর্শ দেন তখন অনেকটাই দেরি হয়ে যায়। তবে সমস্ত ধূমপানই যে সবসময় স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তা কিন্তু নয়, আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে যদি ধূমপান করা যায় তাহলে তা বরং স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হয়।

ধূমপানের নল প্রস্তুতিকরণ-বিধি ও ধূমপানের উপকারিতা :

চরকসংহিতায় পাওয়া যায় রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু,

---

[১] পৌরা, অভি., পৃ.৪৭

[২] কৌ.*অর্থ.*, ২.২৫.২

কালোজিরে, নাগেশ্বর, নখী, বালা, রক্তচন্দন, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাইচ, বেনায়মূল, পদ্মের ডাঁটা, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু, জটামাংসী, গুগ্গুল, অগরু, চিনি, বটের ছাল, যজ্ঞ ডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ছাল, লোধ ছাল, শ্বেত দূর্বা, মুথা, ধুনা, শৈলজ, পদ্মকেশর, কুমুদ কেশর, নবনীতখোটি, শিলারস এবং গেঁটলা-এই দ্রব্যগুলি সমানভাগে চূর্ণ করে জল মিশিয়ে এক আঙুল পরিমাণ লম্বা শরের গায়ে প্রলেপ দিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর সেই প্রলেপ শুকিয়ে গেলে তার ভেতর থেকে শরটি বের করে নিয়ে ওই শুষ্ক ও শূন্যগর্ভা বর্তিতে ঘি মাখিয়ে একদিকে আগুন লাগিয়ে অন্যদিকে ধূমপান নল পরিয়ে সুখে পান করলে তা শরীরের পক্ষে উপকারী হয়। *চরকসংহিতায়* এই প্রক্রিয়ার নাম প্রায়োগিকী বর্তি।[৩] এছাড়া বসা, ঘৃত ও মোম দ্বারা যুক্তিযুক্ত জীবক, ঋষভকাদি উৎকৃষ্ট ঔষধি দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করে ধূমপানের উপদেশ পাওয়া যায়, এই প্রক্রিয়ার নাম স্নৈহিকী বর্তি।[৪] শ্বেত অপরাজিতা, লতাফটকী হরিতাল, মনঃশিলা এবং অগুরু ও তেজপত্রাদি গন্ধদ্রব্যসমূহ পেষণ করে পূর্বোক্ত প্রকারে বর্তি প্রস্তুত করে তার ধূমপান করলে শিরোবিরেচন হয়।

শিরবিরেচনের জন্য ধূম নালিকা প্রস্তুত করতে হলে ধূমপায়ীর নিজ আঙুল পরিমাণে চব্বিশ আঙুল পরিমিত নল করতে হবে। স্নৈহিক ধূমপানে বত্রিশ আঙুল পরিমিত নল এবং প্রায়োগিক অর্থাৎ প্রাত্যহিক ধূমপানে ছত্রিশ আঙুল পরিমিত নল করা উচিত। যে ধূমপানের নল ঋজু অথচ তিনটি পর্বে সংঘটিত, যার অগ্রভাগের ছিদ্র কোলাস্থি সংযুক্ত অর্থাৎ কুলের আঁটি প্রবেশযোগ্য এবং যে নল ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি, বেণু প্রভৃতি ও যে যে দ্রব্যে বস্তিনল প্রস্তুত করতে হয় সেই সেই দ্রব্যে নির্মিত হবে। যে ধূম দীর্ঘ নল যোগে অতি দূর হতে প্রত্যেক পর্বের সন্ধিস্থলে বিচ্ছিন্ন হয়ে নলের ক্রম সূক্ষ্মত্ব হেতু ক্রমশ সূক্ষ্ম ধারায় আসছে, সেই নল বিনিঃসৃত ধূম যথাকালে এবং পরিমিত মাত্রায় সেবন করলে ইন্দ্রিয়সমূহের কোনো ক্ষতি হয় না। এই কারণেই ধূমপান নল দীর্ঘ, ত্রিভঙ্গ এবং ক্রমে সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে যে একদা ধূমপান করা হত তার নির্দশন হাজারদুয়ারির মতো প্রাচীন রাজবাড়িতে বা কলকাতা জাদুঘরে এখনও সংরক্ষিত আছে।

চরকসংহিতায় ধূমপানের উপকারিতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মাথাভার, মাথাভার বেদনা, পীনস, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, কাশি, হিক্কা, শ্বাস, গলগ্রহ, দাঁতের দুর্বলতা, কান, নাক, ও চোখ হতে দোষজস্রাব, মুখ এবং নাকের দুর্গন্ধ, দন্তশূল, অরুচি, হনুগ্রহ (চোয়ালধরা), মন্যাগ্রহ (ঘাড়ের শির টান ধরা) কণ্ডু, ক্রিমি, মুখের পাণ্ডুতা, শ্লেষ্মপ্রসেক, স্বরভঙ্গ, গলশুণ্ডিকা, উপজিহ্বিকা, টাক, পিঞ্জরত্ব, কেশ বিকৃত ও কুঞ্জিত হওয়া কেশের পতন, হাঁচি, অতি তন্দ্রা বুদ্ধি বিভ্রম, ও অতি নিদ্রা এই সকল পীড়া ধূমপানে প্রশমিত হয়।[৫] বর্তি ধূমপান করলে কেশের কপলাস্থির, ইন্দ্রিয়সমূহের ও স্বরের বল বৃদ্ধি হয়। ধূমপান করলে উৎকট বাতশ্লৈষ্মিক ও কণ্ঠ মুখবিবর -কর্ণ-নাসা-অক্ষি ও শিরোজাত রোগ হয় না। হৃদয়, কণ্ঠ ও ইন্দ্রিয়ের সম্যক শুদ্ধি, মাথা হালকা হওয়া, কুপিত দোষের প্রশমন-এই সম্যক্ ধূমপানের ফল।

ধূমপানের নিয়ম :

ধূমপানের আটটি কাল *চরকসংহিতায়* নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সমস্ত কালে বাতশ্লেষ্মার বহির্গমনোন্মুখতা পরিলক্ষিত হয়। স্নানের পর, আহারের পর, বমনের পর, হাঁচির পর, দাঁত ধোয়ার পর, নস্য গ্রহণের পর এবং অঞ্জন প্রয়োগের পর এই আটটি কালে আত্মবান ব্যক্তি ধূমপান করবেন। এই সমস্ত কালে ধূমপান করলে উর্ধ্বজত্রুগত বাতাত্মক ও কফাত্মক রোগসকল হতে পারে না।[৬] অল্প অল্প বিশ্রামের পর তিন তিনবার করে ধূমপান করতে হয়। প্রায়োগিক ধূমপান দিনের মধ্যে দুইবার পান করা কর্তব্য, স্নৈহিক ধূম এককালে একবার মাত্র পানের এবং বিরেচন ধূম অবস্থা বুঝে দিনে তিন

[৩] *চরক. সং.*, পৃ.৪৬

[৪] তদেব

[৫] *চরক. সং.*, পৃ.৪৭

[৬] তদেব

চারবার ধূমপান করা যেতে পারে।

ধূমপানের বিধি নিষেধ :

চরকসংহিতায় ধূমপান সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিরিক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ বিরেচনের পর ধূমপান করা উচিত নয়। বস্তিকর্ম করার পর ধূমপান বিহিত নয়। রক্তদোষে, বিষদোষে, শোকার্ত অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, শ্রান্ত হলে, মদরোগে, আমরোগে, পিত্তদুষ্টিতে, রাত্রি জাগরণে, মূর্ছা ও ভ্রমরোগে, তৃষ্ণার সময়, শরীর ক্ষীণ হলে, ক্ষত অবস্থায়, মদ্য, দুগ্ধ, ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য ও মধুপানের পর, দধিভোজন ও রুক্ষ দ্রব্য সেবনের পর, ক্রোধ জন্মানোর পর, তালুশোষে, তিমিররোগে, মস্তকে আঘাত লাগার পর, শঙ্খকরোগে, রোহিনীরোগে এবং মেহ ও মদাত্যয় রোগে ধূমপান নিষিদ্ধ।[৭] অজ্ঞানতা বশত যে ব্যক্তি এইসব নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে ধূমপান করেন, তাঁর ওই সব রোগ ভয়ংকরভাবে বেড়ে যায়।

মাথা, নাক ও চক্ষুজনিত রোগে ধূমপান করবার উপযুক্ত ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা ধূমপান করবেন। রোগ কণ্ঠগত হলে মুখ দ্বারা ধূমপান করা উচিত। ঘ্রাণপব্যক্তি নাসিকা দ্বারা ধূমপান করে মুখ দিয়ে তা ত্যাগ করবেন। মুখ দিয়ে ধূমপান করে নাসিকা দিয়ে তা বার করা উচিত নয়। কারণ ওই ধূম প্রতিলোমভাবে দ্রুত চক্ষুদ্বয়ের অনিষ্ট করতে পারে। আত্মবান ব্যক্তি যখন নাসিকা দ্বারা ধূমপান করবেন তখন ধূমপান কালে দেহ এবং চক্ষু সরলভাবে রাখবেন। সুখে বসবেন, নাসিকার একটি ছিদ্র রোধ করে অন্য ছিদ্র দ্বারা পর্যায়ক্রমে তিনবার, তিনবার করে-ন-বার মনোযোগের সঙ্গে ধূমপান করবেন। নাসিকা দ্বারা পীত ধূম মুখ দিয়ে ত্যাগ করা বিধেয়। ধূমপানে যখন বক্ষস্থলে, কণ্ঠের ও মস্তকের লঘুতা সম্পাদিত হয় এবং কফ তরল হয়ে থাকে তখন ধূম সুপীত হয়েছে বোঝা যায়।[৮] ধূমপান করেও স্বর অবিশুদ্ধ, কণ্ঠ কফযুক্ত এবং মস্তক স্তিমিত থাকলে বুঝতে হবে যে ধূম সম্যকভাবে পান করা হয়নি।

ধূমপানের কুফল :

ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। ধূমপানের ফলে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, লিভার ও মুখবিবরের বিভিন্ন অংশে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে। অনিয়ন্ত্রিত ধূমপানের ফলে কাশি, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মা, রক্তচাপবৃদ্ধি, স্ট্রোক, এমনকি ক্যান্সার নামক মারণব্যাধিও হতে পারে।

চরসংহিতায় বলা হয়েছে- অকালে অতিমাত্রায় ধূমপান করলে বধিরতা, অন্ধতা, মূকত্ব, রক্তপিত্তদুষ্ট ও মাথা ঘোরা এই সকল রোগের উপদ্রব ঘটে থাকে।[৯] অতিরিক্ত মাত্রায় ধূমপান করলে তালু, মূর্ধা এবং কণ্ঠ শুষ্ক হয় ও জ্বলতে থাকে। তৃষ্ণা পায়, মোহ জন্মায়, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, মাথা ঘুরতে থাকে, মূর্ছাপ্রাপ্তি হয় এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যথা করতে থাকে।[১০]

নস্যসেবন বিধি ও তার উপকারিতা :

নস্য বা নস্যি হল- নাকের মধ্যে প্রয়োগ করা বা নেওয়া হয় এমন তামাক চূর্ণ। নস্যসেবন বিধি ও নস্যের উপকারিতা প্রসঙ্গে *চরকসংহিতায়* বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি যথাকালে কথিত প্রকারের নস্যকর্ম নিষেবেন করবেন, তাঁর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকার কোনো পীড়া হয় না। শ্মশ্রু ও কেশ শ্বেত বা কপিল বর্ণ হয় না। কেশ সকল উঠে যায় না বরং বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। তার মন্যাস্তম্ভ, শিরঃশূল, অর্দিত হনুগ্রহ, পীনস, অর্ধাবভেদ এবং শিরঃকম্প প্রশমিত হয়। তার শিরা, মস্তকাস্থির, সন্ধি সকল, স্নায়ু, কণ্ডরা, সকল নস্য ব্যবহারে অধিক হয়। মুখমণ্ডল প্রসন্ন ও পরিপূর্ণ হয়, স্বর স্নিগ্ধ, স্থির এবং গম্ভীর হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল বিমল ও অধিক বল বিশিষ্ট হয়। উর্ধ্ব জত্রুগত রোগ সকল সহসা নস্যসেবীকে আক্রমণ করতে পারে না এবং জরা অবস্থাতেও তার উত্তমাঙ্গ জরা লক্ষণ সকল প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

---

[৭] *চরক. সং.*৪৯

[৮] তদেব, পৃ.৫০

[৯] *চরক. সং.*, পৃ.৪৮

[১০] তদেব, পৃ.৫১

[১১] তদেব

ধূমপানবশত স্রোতসমূহ হতে রক্ত বর্ষণ হলে অণু তেলের নস্য ব্যবহার করতে হয়। কেবল বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত কালে আকাশ মেঘশূন্য হলে এর ব্যবহার করা উচিত নয়। অনু তেলে চারতলা পরিমাণ নস্যের দ্বারা দিনে তিনবার নস্য কার্য করতে হয়। নস্য নেওয়ার আগে তেল দ্বারা মাথা স্নিগ্ধ ও উষ্ণ জল দ্বারা মাথা সিক্ত করতে হয় এবং তুলি দিয়ে এই নস্য ব্যবহার করতে হয়। উষ্ণাচারী, হিতাশী ও নিয়তেন্দ্রিয় হয়ে বায়ুশূন্যস্থানে এই নস্য নিতে হয়। এই তেল ত্রিদোষনাশক এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বলপ্রদ। যথাসময়ে এই অনুতৈলের নস্য গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত ফল পাওয়া যায়। অকালে বা অতিমাত্রায় ধূমপান করাতে যদি বায়ু পিত্তানুগত হয় তাহলে ঘৃত পান এবং স্নেহদ্রব্য ঘটিত নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ প্রয়োগ করা উচিত। রক্তপিত্তে শীতল দ্রব্য ঘটিত নস্য, অঞ্জন, তর্পণ এবং শ্লেষ্মপিত্তের প্রকোপে রুক্ষতা সম্পাদনকারী নস্য, অঞ্জন ও তর্পণ প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

সুরা বা মদ্য:

সুরা হল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত মদ্য বা মদ। আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয়সম্মত মদ শুধুমাত্র ভেষজ উপাদানে প্রস্তুত করা হত। কিন্তু বর্তমানে বার্লি, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, আঙুর, আপেল প্রভৃতি রসের সঙ্গে ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়।

মদ্যের প্রকারভেদ ও মদ্যপ্রস্তুতি বিধি:

বর্তমানে উৎপাদনের ভিত্তিতে মদ দেশি (বাংলা), বিদেশি, চোলাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। কৌটিল্যীয় *অর্থশাস্ত্র*-এ দুষ্ট (দোষযুক্ত) সুরা ও উত্তম সুরার কথা আছে। এছাড়াও সেখানে প্রকৃতি অনুসারে মেদক, প্রসন্না, আসব, অরিষ্ট মৈরেয় ও মধু এই ছয়-প্রকার সুরার স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে। আবার **ক.** সহকারসুরা (যে-সুরাতে আম্ররস বা আম্রতৈলাদি মিশ্রিত করা হয়), **খ.** রসোত্তরা (যে-সুরাতে গুড়প্রতিবাপ যোগ করা হয়), **গ.** বীজোত্তরা/মহাসুরা (যাতে বীজদ্রব্যের মাত্রাধিক্য থাকে) **ঘ.** সম্ভারিকী (যে-সুরাতে সম্ভারের মাত্রার আধিক্য থাকে) ভেদে সুরা বিভিন্ন প্রকারের হয়।[১২] উল্লেখ্য কৌটিলীয় *অর্থশাস্ত্র*-এ প্রাপ্ত এইসব বিভিন্ন প্রকার সুরার নির্দেশ আছে *চরকসংহিতা* ও *সুশ্রুতসংহিতায়*।[১৩]

মদ্যপানবিধি ও মদ্যপানের উপকারিতা:

এখন যেমন নবজাতকের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে করে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই মানুষের আনন্দ-বিনোদনের অন্যতম পানীয় হল মদ। কিন্তু সেকালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই একমাত্র মদ্যপানের বিধান ছিল। যেমন- কৌটিল্যীয় *অর্থশাস্ত্র* -এ বলা হয়েছে বসন্তাদি উৎসবে, বন্ধুবান্ধব সমাজে (সম্মিলনে), যাত্রায় (ইষ্ট দেবতার শোভাযাত্রায়) চারদিন পর্যন্ত সুরা ব্যবহারের অনুমতি মিলত। অনুমতি ছাড়া সুরাপান করলে তাঁদের প্রহবন বা তুষ্টি ভোজনের পরে প্রতিদিন তাঁদের থেকে দণ্ড(কর) গ্রহণ করা হত।[১৪] যাঁরা সুরা নিয়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি পাবে না, তাঁরাই পানাগারে বা মদের দোকানে মদ্যপান করতে পারবেন।

সুশ্রুতসংহিতায় বলা হয়েছে যদি বিধি মেনে মদ্যপান করা যায় তাহলে মদ্যপানে বহু গুণ আছে। মদ্য স্নিগ্ধ অন্ন, মাংস ও উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সেবন করলে আয়ু বৃদ্ধি, বল বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ হয়। কমনীয়তা, মনের সন্তুষ্টি, ধৈর্য, তেজ ও অতিপরাক্রম প্রভৃতি গুণের প্রকাশ পায়।[১৫] শুধু তাই নয়, মদ্যপানে বীর্য, রতি, প্রীতি, হর্ষ ও বক্তৃতাদি বৃদ্ধি পায়। মদ্য স্বভাবত উষ্ণ ও অম্ল এবং

---

[১২] কৌ.অর্থ. ২.২৫. ৩১-৩৪

[১৩] চরক.সং.,৩১৪-৩১৫

[১৪] কৌ.অর্থ. ২.২৫.৩৬

[১৫] স্নৈগ্ধৈস্তদন্নৈর্মাংসৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ সহ সেবিতম্। ভবেদায়ুঃ বলায়োপচয়ায় চ।। কাম্যতা মনসস্তুষ্টির্ধৈর্য্যং তেজোহ'তিবিক্রমঃ।
বিধিবৎ সেব্যমানে তু মদ্যে সন্নিহিতা গুণাঃ।।সুশ্রুত. ৪৭.৩

[১৬] চরক. সং., পৃ.৩১৩

[১৭] তদেব., পৃ.৩১৪

তার বিপাকও অম্ল। *চরকসংহিতায়* সামান্য সুরাপানের গুণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- কৃশ ব্যক্তি, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী, গ্রহণী ও অর্শ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এবং যে-সমুদয় লোকের শরীরে রক্ত ক্ষয় হয়েছে-এরূপ ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সুরাপান প্রশস্ত। সুরা বায়ু ও স্তনদুগ্ধজনক। হিক্কা, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, কাস, মলবদ্ধতা, অরুচি, শর্দি ও বিবন্ধ প্রভৃতি রোগে মদিরা হিতকারী। মদিরা বায়ু বিনাশক।[১৬] শূল প্রবাহিকা, আটোপ এবং কফ, বাত ও অর্শ রোগ জগল মদ্য হিতকর। ইহা সংগ্রাহী, রুক্ষ, উগ্র, শোথ- নাশক ও খাদ্যজীর্ণকারক। শোথ, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, জ্বর এবং কফজনিত রোগ সকল অরিষ্ট মদ্য ব্যবহারে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই অরিষ্ট মদ্য, অগ্ন্যুদ্দীপক এবং রুচিজনক। শর্করা অর্থাৎ চিনি থেকে উৎপন্ন মদ্য মুখপ্রিয়, ঈষৎ মাদক, সুগন্ধ, বস্তিগত বেদনা বিনাশক এবং জারক। বিশেষত, পুরাতন অবস্থায় হৃদ্য ও বর্ণকর হয়ে থাকে। পক্ব রস বা গুড় থেকে যে-মদ্যের উৎপত্তি হয়, তা মুখরোচক, অগ্নিবর্ধক, হৃদ্য এবং যক্ষ্মা, শোথ অর্শ রোগে হিতকর। ওইটি স্নেহ ও শ্লেষ্মাজাত রোগ বিনাশক এবং বর্ণ বর্ধক। ইক্ষুর অসিদ্ধ বা শীতলাবস্থায় রসের দ্বারা যে-আসব উৎপন্ন হয়, তা জারক, কোষ্ঠ, পরিষ্কারক, স্বর ও বর্ণশোধক, লেখন এবং শোথ, উদর ও অর্শ্ব রোগে বিশেষ হিতকর। গুড়োৎপন্ন আসব, বিশোধক, বায়ুনিঃসারক, মলভেদক, তর্পক এবং অগ্নির উদ্দীপক। আক্ষিকী সুরা পাণ্ডু ও ব্রণ রোগের পক্ষে হিতকর ও দীপনীয়।[১৭]

সুরাসব-তীব্র, মত্ততা-উৎপাদক, বায়ুনাশক এবং মুখপ্রিয়। মধ্বাসব-অর্থাৎ মহুয়া ফলজাত আসব মলভেদক ও তীক্ষ্ম। মৈরেয় আসব মধুর ও গুরুপাক। ধাতক্যভিযুত অর্থাৎ ধাইফুল জাত আসব হৃদ্য, রুক্ষগুণান্বিত, রুচিজনক এবং অগ্ন্যুদ্দীপক। কিশমিশ ও ইক্ষুজাত আসব মাধ্বীক আসবের ন্যায় গুণান্বিত এবং উষ্ণবীর্য নয়। মধুজাত আসব-মুখরোচক, অগ্নিবর্ধক, হৃদয়গ্রাহী, বলকর, পিত্তের অবিরোধী, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, কফনাশক এবং লঘু অল্প বায়ু বর্ধক। যবমণ্ড-জাত সুরা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, বায়ু ও পিত্তবর্ধক, গুরুপাক এবং উদর স্তম্ভিত করিযা জীর্ণ হয়। কিন্তু মধুলক (গোধূম) কৃত মদ্য শ্লেষ্মাবর্ধক। সৌবীরক ও তুষোদক মদ্য অগ্ন্যুদ্দীপক, জীর্ণকর, হৃৎ, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগনাশক, গ্রহণী ও অর্শ্ব রোগের পক্ষে হিতজনক ও মলভেদক। অম্লকাঞ্জিক মর্দনে দাহ জ্বর নিবারণ হয় এবং পান করলে বায়ু ও কফ নষ্ট হয়। এটি কোষ্ঠ পরিষ্কারক, অবিস্রংসি এবং অগ্নিবর্ধক। নতুন মদ্য প্রায়ই গুরুপাক ও দোষোদ্দীপক হয়ে থাকে। সাত্ত্বিকভাবে নিয়মপূর্বক মদ্য পান করলে ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। এটি দ্বারা দৈহিক স্রোত (শিরা) সমূহের শোধন হয়। এটি জারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, লঘুপাক, মুখরোচক, আনন্দদায়ক, শরীরে তৃপ্তিজনক, বলকারক, ভয়, শোক ও শ্রমনাশক এবং প্রগলভতা, বীর্য, বুদ্ধি, প্রতিভা, তুষ্টি পুষ্টি ও বলপ্রদ।[১৮]

মদ্যাসক্তির কুফল :

মদ্য উষ্ণ, তীক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, বিশদ, রুক্ষ আশুকর, ব্যবায়ী ও বিকাশী। *সুশ্রুতসংহিতায়* মদ্যের উক্ত স্বরূপ ও তার ক্ষতিকারক রোগের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- মদ্য উষ্ণতা হেতু পিত্ত প্রকোপক, তীক্ষ্মতা হেতু মনোগতির বাধক, সূক্ষ্মতা হেতু স্রোতঃসমূহে প্রবেশকারক, বিশদত্ত হেতু কফ, শুক্র, নাশক, রুক্ষত্ব হেতু বায়ু প্রকোপক, আশুকরত্ব হেতু আশুকারী এবং ব্যবায়ী বলে হর্ষপ্রদ ও বিকাশী বলে সর্বদেহে বিসর্পণকারী।[১৯] মদ্য প্রধানত অম্লরস, লঘু, রোচন এ দীপন। কারও কারও মতে মদ্যে লবণ ভিন্ন পঞ্চরসই আছে। বিধি মেনে যদি মদ্যপান না-করা হয় বা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে উন্মত্ততা সৃষ্টি হয়, কায়াগ্নির সঙ্গে মিলে মদ্য অগ্নি তুল্য হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ অসাড় হয়ে যায় এবং ভাবান্তর ঘটে এবং নিজের নিগূঢ় ভাবও প্রকাশ করে ফেলে। মদ্যপানের মধ্য ও পশ্চিম অবস্থায় প্রলাপ, হর্ষ, সংজ্ঞাহীনতা, কর্ম ও ক্রিয়ার গুণ নষ্ট হয়। নিত্য ও অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে শরীরে

[১৮] তদেব., পৃ.৩১৫

[১৯] *সুশ্রুত.সং.*, পৃ.৭৯৮

[২০] *সুশ্রুত.সং.*, (উত্তরতন্ত্র)৪৭.৪

[২১] তদেব, ৪৭.৫-৬

পৌষ্টিকতন্ত্র (লিভার, কিডনি প্রভৃতি) বিনষ্ট হয়।[২৩] যা আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় - পাকস্থলী ও অন্ত্রে আলসার, ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস ও লিভার সিরোসিস রোগ হয়। গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। ক্রুদ্ধ, ভীত, পিপাসিত, শোকসন্তপ্ত, ক্ষুধার্ত, পীড়িত, ভ্রমণক্লান্ত, রোগগ্রস্থ, অতিশয় অল্পভোজনে বিকৃতোদর, অজীর্ণভুক্ত, অবল, উষ্ণাভিতপ্ত ব্যক্তি মদ্যপান করলে বিভিন্ন বিকার পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি থেকে পানাত্যয় রোগ হয়। জড়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, অঙ্গমর্দ, হৃদয়পীড়ন, কম্প, শিরোবেদনা, স্বেদ, প্রলাপ, মুখশোষ, দাহ, মূর্ছা, চোখ, মুখের পীততা, বমি, শীত, কফ ও শ্লেষ্মাত্মক, সান্নিপাতিক প্রভৃতি পানাত্যয়ের লক্ষণ।[২১] অতিশয় মদ্যাসক্তিবশত উত্তর ও ওষ্ঠ স্বাভাবিক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়, শরীরে কখনও শীত, কখনও অতিশয় প্রদাহ, মুক্ত তৈলাক্ত হয়। জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত, কালো বা নীলাভ হয়, চক্ষু হয় পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ, হিক্কা, জ্বর, বমি, কম্পন, পার্শ্বশূল, ভ্রম প্রভৃতি বিকার পরিলক্ষিত হয়।

পানাত্যয়াদি রোগের প্রতিষেধক

সুশ্রুতসংহিতায় পানাত্যয়াদি রোগের ওষুধ সম্পর্কে বলা হয়েছে- বাতজ মদাত্যয়ে-চক্র, মরিচ, আর্দ্রক, যমানী, কুড় ও সৌবর্চন (লবণের) সঙ্গে মদ্যপান করা উচিত। অথবা জিরা জোয়ান, শুঁঠ, হিঙ্গু ও সৌবর্চলের সঙ্গে মদ্যপান করতে হবে। কিংবা আমড়া, আম, ডালিম, মাতুলুঙ্গরসের সঙ্গে উৎকৃষ্ট যাড়ব ও পানকসকল পাক করে সেবন করণীয়। অথবা ডালিমাদি ফলের রসের সঙ্গে সিদ্ধ মাংস-রসাদি ও জলচর জন্তুর মাংসসমূহও ভোজন করা উচিত। পিত্তাত্মক মদাত্যয়ে মধুর শ্রেণির কষায়ের সঙ্গে মধুশর্করামিশ্রিত উষ্টগন্ধ মদ্য পান করা উচিত। এছাড়া ইক্ষুরসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ মদ্য পান করে মুহূর্তের মধ্যে নিঃশেষে বমি করে ফেলতে হবে। পরে অম্ল, লবণ বা তিত্তির মাংসে রস কিংবা ঘৃত বা চিনির সঙ্গে মুদ্গাযূষ পান করতে হবে। কফজপানাত্যয়ে বিম্বীফল, বেতস ও জলের সঙ্গে মদ্যপান করে কফ বমি করতে হবে। আর তিক্ত কটু উৎকৃষ্ট মাংস রসসমূহ এবং তিক্তকটু মিশ্রিত রস সেবন করতে হবে। কফজ মদাত্যয়ে নানা প্রকার যবান্ন ও জাঙ্গল মাংস সেবন করা উচিত। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে সর্বপ্রকার মিশ্রিত চিকিৎসা ও পানাদি করা উচিত। সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে- সর্বপ্রকার মিশ্রিত চিকিৎসা ও পানাদি করা উচিত। এছাড়া পানাত্যয়ে- মনের সুখকর হয় এমন কয়েকটি উপায় হল- দারুচিনি, নাগেশ্বর, পিপুল, ছোটো এলাচ, মধুক (মৌল), ধনে, জিরা ও মরিচ সমানভাগে ভাগ করে এদের সঙ্গে কপিত্থরস, জল ও পরুষকের পানা কাপড়ে ছেঁকে পান করা উচিত। গায়ে বালা, পদ্ম, পরিপেলব, করবীফুল, জলজ ফুল এসবের প্রলপে দিতে হবে এবং নির্মল, সুশীতল জল পরিষেক করতে হবে। মদরোগে- গাম্ভারীফল, দেবদারু, বিড়লবণ, দাড়িম, পিপুল ও দ্রাক্ষা পেষণ করে জলের পানা করে তা পিপুলের সঙ্গে পান করলেও আশু ফল লাভ হয়। এভাবে দ্রাক্ষা, চিনি, যষ্টিমধু, জিরা, ধনে ও পিপুলের পানা ত্রিজটার সঙ্গে পান করা উচিত। আর সৌবর্চলযুক্ত উৎকৃষ্ট মাংসরস পান করতে হবে সেই সঙ্গে শরীরে প্রয়োজনমতো জল পরিষেক করতে হবে।[২২]

এভাবে দেখা যায় যে আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয় বিধি মেনে মাদক দ্রব্য সেবনের উপকারিতা, অনিয়মিত মাদক দ্রব্য সেবনে বিভিন্ন রোগ এব তাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধকের বিধানও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বিধি না-মেনে অনিয়ন্ত্রিত এবং দূষিত মাদকদ্রব্য-সেবনের কারণে শরীরে বিভিন্ন ক্ষতিকারক বা মারাত্মক দিকটাই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। বস্তুত, মানবকল্যাণের জন্য প্রযুক্ত যে-বিজ্ঞান, যা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের অনন্ত সাধনার ফসল, তা যদি মানুষের ধ্বংসের জন্য না-বুঝে বা অশুভ চিন্তার দ্বারা প্রযুক্ত হয় বা অপপ্রয়োগ করা হয়, তার দায় সেই দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের, বিজ্ঞানের নয়। ঠিক তেমনি

[২২] *সুশ্রুত.সং.*, ৪৭.১৫-১৬

[২৩] ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ। *মনু.* ৭.৪৫

মানুষের নীরোগ ও সুস্থ জীবন যাপনের বিধি নিষেধের নির্দেশক আয়ুর্বেদশাস্ত্রও প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান মনীষায় উদ্ভূত। তাই মাদকাসক্ত না-হয়ে যদি সুস্থ মনে আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত বিধি মেনে পরিমিত মাদক দ্রব্য সেবন করা হয়, তাহলে তার সুফল নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন- আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত মাদক দ্রব্য যদি এতই উপকারী হয় তাহলে বর্তমানে মাদকে কেন এত পরিমাণে শরীরের ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদি (অ্যালকোহলাদি)র ব্যবহার করা হয়? এর উত্তরে বলা যায়, আয়ুর্বেদশাস্ত্রসম্মত মদ্য প্রস্তুতির উপকরণসামগ্রী প্রয়োজনীয় চাহিদার থেকে অনেকটাই অপ্রতুল এবং সেগুলি সংগ্রহ ও উৎপাদন করা অনেকটা ব্যয়সাপেক্ষ আর সময়সাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে অনেক সস্তায় ও পর্যাপ্ত পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে মাদক দ্রব্যের উৎপাদনও খুব সত্বর সম্ভব হয়। সে-কারণেই সম্ভবত অনেকে মাদক দ্রব্যের উপকারী দিকের কথা না-ভেবে সস্তায় (রাসায়নিক) মাদক দ্রব্যের নেশায় মশগুল থাকতে পছন্দ করেন।

মানুষের অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন ও মাদকাদি-ভোগসক্তির পরিণামের কথা বিবেচনা করে মহামতি মনু বহুকাল আগের বিষয়ভোগাসক্তি অত্যন্ত দুঃখজনক বলে এবং ব্যসনী ব্যক্তির নরকপ্রাপ্তির ভয় দেখিয়ে যাবতীয় আসক্তি বর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২৩] উল্লেখ্য, সেখানে সর্বপ্রকার ভোগাসক্তি অপেক্ষা সহজে চেতনালুপ্তি ও ধনক্ষয়, দেহ বিনাশের আশঙ্কায় মদ্যপানকে সবচেয়ে কষ্টদায়ক ব্যসন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনুর সেই সতর্কবাণীকে উপেক্ষার কারণে আজ মাদকাসক্তির নেশায় সমস্ত জগৎ যেন টলমল করছে। সংকীর্ণ-রাজনীতিতে স্বার্থান্বেষী, দুরাচারী, দুষ্কৃতিদের দ্বারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রকার মাদকাসক্তিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে মোহাচ্ছন্ন করে গোটা সমাজ ক্রমশ বিপথে চালিত হচ্ছে। তাই এখন আর আয়ুর্বেদশাস্ত্রীয় বিধি মেনে মাদক দ্রব্য-সেবনের সুফলের কথা না ভেবে অবিলম্বে বিপন্ন পরিবার, সমাজ-সংস্কৃতি, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সার্বজনীন নিরাপত্তার স্বার্থে এবং যুবসমাজের আশু-বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা করতে যাবতীয় মাদক দ্রব্যসেবন বর্জন ও তার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদে সকলের শামিল হওয়া একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থপঞ্জি:

কাঙলে, আর.পি.(সম্পা.) *কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র*, দিল্লী: মোতিলাল বনারসী দাশ, ২০০৬(পুনঃমুদ্রিত)

নাগ, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র.(সম্পা.) *চরক সংহিতা*, কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪

(যাদবপুর, কলকাতা)

চিঠিপত্তর

'নিবেদন' পত্রিকার সম্পাদক সমরকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের মাধ্যমে 'নিবেদন'-এর নিয়মিত পাঠিকা হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। নানা স্বাদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি প্রভৃতির সমন্বয়ে পত্রিকাটি আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'নিবেদন' পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে আমি যেমন সমৃদ্ধ হচ্ছি তেমনি বিভিন্ন নতুন নতুন লেখক-লেখিকার অভিনব সৃষ্টির আন্তরিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নমস্কারসহ,
চম্পা পাল
বেহালা পর্ণশ্রী, কলকাতা-৬১

'নিবেদন' সাহিত্য পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের সংখ্যাটি পড়লাম। পত্রিকাটি ছোটো গল্প, কবিতা, ভ্রমণকাহিনি এবং বিভিন্ন রম্যরচনায় ভরা এক সুন্দর সংকলন। লেখাগুলি বড়ো হৃদয়গ্রাহী। এতগুলি লেখা এক সংকলনে আনার জন্য সম্পাদকমহাশয়কে ধন্যবাদ। মুদ্রণ যথাযথ। পরবর্তী সংখ্যার জন্য শুভেচ্ছা রইল।

শ্যামল ঘোষ রায়
বেহালা, কলকাতা - ৩৪

'নিবেদন' পত্রিকার লেখাগুলি যেমন প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী তেমনি মনোরঞ্জক।

দেবযানী পাত্র
পৈলান, দ ২৪ পরগনা

'নিবেদন' পত্রিকার আমি সাম্প্রতিক সদস্য হয়েছি। খুব ভালো লাগল পড়ে। আশাকরি আগামী দিনে আরও ভালো হবে। অনেক শুভেচ্ছা রইল।

ধন্যবাদসহ
ত্রিদিবেশ মুখোপাধ্যায়
সরশুনা, কলকাতা-৬১

'নিবেদন' পত্রিকাটি পড়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে। কারও কারও জীবনের চলার পথে কিছু টুকরো টুকরো ঘটনাগুলি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষায় আছি। শুভ কামনা রইল।

রমেন্দ্র দাশ তালুকদার
বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক

'নিবেদন' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যাটিতে প্রথমেই ভালো লাগে এর প্রচ্ছদ। আমাদের সাহিত্য ভাবনায় কবিগুরুর যে, উচ্চপীঠে স্থান তাঁকে সেথায় সমাসীন করে, তাঁকে প্রণাম জানিয়েই শুরু হল এই সংখ্যার।
এবারের সংখ্যায় বিশেষভাবে নজরে আসে এর অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং আবেদনশীল কবিতা বিভাগটি। বেশ কয়েকটি পদ্য- 'শুকতারা', 'আকাশের ছবি', 'কবিতাগুচ্ছ', 'জীবনানন্দকে অনুরোধ'-এরা সবাই উল্লেখযোগ্য এবং বারবার পড়ার মতো।
ছোটোগল্পের মধ্যে আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও চরিত্র চিত্রায়ণে মুগ্ধ করে 'শ্মশান সর্দার'।
এই সংখ্যার আর-এক বৈশিষ্ট্য এর প্রবন্ধটি এবং বিশেষ রচনাটি।
তথ্যসমৃদ্ধ অথচ পাণ্ডিত্যের বহিঃপ্রকাশ বর্জিত এই লেখা দুটি সমগ্র পত্রিকাটির সামগ্রিক মানোন্নয়ন করে।
সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ এমন একটি পক্ষপাতবিহীন পত্রিকা সুচারুভাবে প্রকাশ করতে থাকার জন্য।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী
বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক

'নিবেদন' ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকার ডিসেম্বর ২০২২ সংখ্যাটি একটি সুপাঠ্য, মনোগ্রাহী ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশনা। যেমন সুপরিকল্পনার ছাপ, পত্রিকাটির প্রচ্ছদে, তেমনই বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য। ছোটোগল্প, কবিতা, রম্যরচনা, নাট্য- আলোচনা, প্রবন্ধ বেশ উচ্চমানের এবং উপভোগ্য। অপূর্ব কর্মকার রচিত 'শ্মশান সর্দার' বিশেষভাবে মনে দাগ দিয়ে যায়। অপূর্ব মিত্রর রচনাটিতে ভ্রমণকাহিনী অপেক্ষা 'দুর্ঘটনা' ও 'হাঙ্গামা' বেশি প্রাধান্য পেয়েছে, যা ভ্রমণকাহিনীর আনন্দ ও বিবরণকে গৌণ করেছে। অন্যান্য রচনাগুলিও বেশ মনোগ্রাহী। পত্রিকার সম্পাদনা আরও বৈচিত্র্যময় করার প্রয়াস করলে এর মান উন্নততর হবে। দু-একটি প্রাচ্য সাহিত্য বা ঐতিহাসিক কাহিনির অন্তর্ভুক্ত পত্রিকাটির মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। তবে রাজনৈতিক বিষয় অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
সমবেত প্রচেষ্টার কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এগিয়ে চলুক 'নিবেদন'।

সঞ্জয় ঘোষ
(বালীগঞ্জ, কলকাতা)

With Best Compliments From :-

Optical.com

Your Eye Your Wealth

Flat 40% + 20% OFF

MADANMOHANTALA

All Branded Company Spectacle Available

- Everyday Doctor for Computerised Eye Testing.
- Exclusive Gift on Every Purchase.
- Free Home Delivery.
- Lifetime Free Service.
- Debit Card Accepted.

74/4, Raja Rammohan Roy Road,
Kolkata - 700 008
(Opp. Tiner Polly Club)

Mob. : +91 9123870864 / 8926577242

With Best Wishes From :-

R. S. InfoTech
you want, we make

Electronics Security Services

We provide cctv installation & services work for home / industry requirement besic and also biometrics / door phone camera / em lock

1, Jibanananda Nagar, Bagpota Link Road, Sarsuna, Kolkata-700061

Contact No. : 7980780656

With Best Compliments From :-

Prolay Adhikary

SAYONI JEWELLERS

146/1, Bhupen Roy Road, Jayasree More
Kolkata - 700 034

Mobile : 9863054143 / 8777678401

With Best Compliments From :-

Prop. : Ashok Paul

New Smart Land
Tailors

Experts in Shirts, Pants, Two & Three Pieces & Jeans.
We deal in Latest dress materials, Cut Pieces of
Renowned Companies with good Stock.

4, SATYEN ROY ROAD, BEHALA,
KOLKATA - 700 034
Ph. : 9051075976

Third Year | Fifth Issue | July 2023

With Best Compliments From :-

ASHIRBAD MEDICAL

All cards accepted here

JOYSHREE MORE
Ph. : 033-2406 6624 / 9051366074

MADAN MOHANTALA
Ph. : 3379622145 / 9432223654

FREE HOME DELIVERY

Sunday Full Closed

With Best Wishes From :-

Kaustav Dasgupta

Mob. : 9830792276
9123338574
kaustavdasgupta19@gmail.com

Care Plus

Medical & Surgical Instruments at your Doorstep
13, Sisir Bagan Road, Behala, Kolkata - 700 034

OXYGEN AVAILABLE 24 X 7

Oxygen	Fowler Bed	Walker
Pulse Osimeter	Air Bed	Stick
Nebulizer	Glucometer	Crutch
BP Monitor	Sling	Wheel Chair

Editor & Publisher : Samar Kishna Mondal & Chief Advisor : Apurba Karmakar
Printed by : Sri Guru Printing Concern, Behala, Kolkata-700034

Exchange Value Rs. 100/-